KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেন্স, কল-৪৫
Collection : KLMLGK	Publisher : বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী
Title : অন্যদিন (ANYADIN)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 24 25 26 27/1	Year of Publication : বর্ষ সংখ্যা ১৩৮৩ Apr - Sep 1977 Apr - Sep 1978 Apr - Jun 1979
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতাকেন্দ্রিক সাহিত্যপত্র

অন্যদিন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র • কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ •

সম্পাদক
শিশির ভট্টাচার্য

গ্রীষ্ম-বর্ষা সংখ্যা
২৬
১৩৮৫

অন্যদিন

অবৈতনিক সম্পাদক ঃ শিশির ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ জীবন সরকার

অন্যদিন প্রধানত তরুণ গোষ্ঠীর ত্রৈমাসিক কবিতাকেন্দ্রিক মুখপত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জীবনধর্মী গল্প, কবিতা ও আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে। চিঠির উত্তর পেতে হলে অনুগ্রহ করে ডাকটিকিটযুক্ত নাম ঠিকানা লেখা খাম পাঠাবেন।

*

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, ক'লকাতা-৪৫ ফোন ৪৫-৩৭১৪।

*

সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, ক'লকাতা-৬ থেকে হরিপদ পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও শিশির ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস ক'লকাতা-৪৫ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ কমল সাহা, প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ইম্প্রেশন হাউস ঃ ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, ক'লকাতা-৯।

*

দাম ঃ দেড় টাকা

গ্রীষ্ম-বর্ষা সংখ্যা ১৩৮৫
সংকলন ২৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

অন্যদিন

প্রবন্ধ

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

গল্প

অধীর বিশ্বাস

কবিতা

অমিত কাশ্যপ * অনীশ ঘোষ * অন্যমন দাশগুপ্ত * অশোককুমার মহান্তী * ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় * ঈশ্বর ত্রিপাঠি * মবিনুল হক * মমতা রায় * মলয় গঙ্গোপাধ্যায় * মানস রায়চৌধুরী * মিঠু মুখোপাধ্যায় * মুকুল চট্টোপাধ্যায় * মুকুল গুহ * মোহন মিত্র * তাপস ভবাই * দীপক সরকার * দেবকুমার মুখোপাধ্যায় * ধীমান চক্রবর্তী * নীলাদ্রিভূষণ হরিচন্দন * পঙ্কজ সাহা * পরেশ সোম * পরম ক্ষত্রিয় * পার্থ মুখোপাধ্যায় * পার্থ সরকার * পরিমল চক্রবর্তী * প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী * বিনোদ বেরা * বিশ্বব চন্দ * বিনতা শাহীন * বিদ্যুৎ ভৌমিক * ব্রততী ঘোষরায় * রণজিৎ দেব * রাজকুমার মুখোপাধ্যায় * শাশ্বতী দেবনন্দী * শ্যামল বসু * শুভাশীষ গোস্বামী * সজল বন্দ্যোপাধ্যায় * সমীর চক্রবর্তী * সত্যাদেশ আচার্য * সমীর চট্টোপাধ্যায় * স্বপন রায় * সনৎ বসু * সাগর চক্রবর্তী * সুশীল পাঁজা * সুরজিৎ ঘোষ * হরপ্রসাদ মিত্র।

বিদেশী কবিতা

স্পেন

ভেসেন্ত আলেকজান্দ্রের
অনুবাদ ঃ গৌরাঙ্গ ভৌমিক

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে

অসমীয়া

মনাজিৎ সিং
অনুবাদ ঃ উদয়ন বিশ্বাস

আলোচনা

শিশির ভট্টাচার্য
জীবন সরকার
পিনাকী ঠাকুর

কবি-পরিচিতি

মালদা

কবিতার খবর

একটি বই, দুই মন ও কালের শ্রদ্ধাঞ্জলি

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে দু'শো বছর আগেকার কথা। ১৭৭৮ সালের অক্টোবর মাস। 'সেদিন শারদ প্রভাতে' হুগলী গ্রামের চার্চের ছোট ছাপাখানা—বৃটিশ ভারতের বাঙলায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ছাপাখানা 'এনড্রুসন প্রেস' থেকে মুদ্রাকর মিঃ চার্লস উইলকিনস্ সদ্যসমাপ্ত একটি ছাপা বই নিয়ে উপস্থিত হলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম বিশ্বস্ত কর্মচারী ও বইটির লেখক ন্যাথানিয়াল ব্রাসি হ্যালহেদের কাছে। কোম্পানির ইংরাজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা জানবার ও জানাবার জন্য রচিত এই বই নিশ্চয়ই গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এই বিশ্বাসে লেখক হ্যালহেদ উপস্থিত হলেন গভর্ণর জেনারেলের সামনে। বৃটিশ শাসক বইটি নিয়ে দেখলেন আখ্যাপত্রের দিকে। সদ্যমুদ্রিত বইটির আখ্যাপত্রে লেখা আছে ঃ

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদব্রেজী
A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
by
NATHANIEL BRASSEY HALHED
ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নযযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥
PRINTED
AT
HOOGHLY IN BENGAL
MDCC LXXVIII.

কিন্তু 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং' লেখা এই বইটিকে ওয়ারেন হেস্টিংস কোন গুরুত্ব দিলেন না। যদিও পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের দৃষ্টিতে ১৭৭৮ সালে এই বইটির প্রকাশন এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ বাংলা হরফে প্রথম ছাপা বই সেদিন সূচিত করেছিল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশ্বসাহিত্যের অন্য কোথা অন্য কোনখানে ছড়িয়ে পড়ার শারোদৎসব। হুগলীর গঙ্গাতীরে সাত সাগর তের নদীর পার থেকে আসা কয়েকজন বিদেশী মানুষ বিদেশী বণিক কোম্পানীর স্বার্থসিদ্ধির ধারণায় সাহায্য করার সুযোগে বাংলাদেশের মাটিতে সংস্কৃতি বিপ্লবের যে বীজ বপন করেছিলেন নিজেদের অজ্ঞাতে, তাই আজ মহামহীরুহে পরিণত হ'য়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নবপল্লবায়িত ও শাখায়িত করে তুলেছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই ব্যাকরণ বই সূচনা করেছে নতুন যুগের। সৃষ্টি করেছে বাংলা মুদ্রণের এক নয়া ইতিহাস। সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুরাগী মানুষের সামনে খুলে দিয়েছে এক নতুন জগতের স্বর্ণদ্বার।

কোথা থেকে এসেছিলেন A GRAMMAR OF THE BENGAL LANGUAGE-এর রচয়িতা হ্যালহেদ আর তাঁর বইয়ের মুদ্রাকর বাংলা ছাপার হরফের স্রষ্টা—মিঃ উইলকিনস? কেনই বা তাঁদের ইচ্ছা হয়েছিল ব্যাকরণ লিখতে আর ছাপার হরফ সৃষ্টি করতে! দু'শো বছর বাদে আধুনিকতম মুদ্রণ শিল্পের সৃষ্টিকে টেবিলের ওপর রেখে অবাক হয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে যে ১৭৭৮ সালের আগে পর্যন্ত ছাপাখানার সঙ্গে বাংলার মানুষের কোন সম্পর্ক ছিল না। শিক্ষা ও সংস্কৃতি তখন পুঁথিনির্ভর। ইচ্ছা থাকলেও বাঙালী মনের সামনে সাহিত্যের কোন খোলা জানালা নেই। নেই জীবন জিজ্ঞাসায় পরিবর্তনের ঝড়, নবজাগরণের আন্দোলন সূচনা করলেন সম্পূর্ণভাবে তাঁদের অজ্ঞাতে।

ন্যাথানিয়াল ব্রাসি হ্যালহেদ ইংলণ্ডের ওয়েস্ট মিনিস্টারে ১৭৫১ সালের ২৫শে মে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাংক অব ইংলণ্ডের ডিরেক্টরের পুত্র হ্যালহেদ কৃতীছাত্ররূপে লণ্ডনের হ্যারোতে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করে অক্সফোর্ডের ছাত্রাবস্থায় খ্যাতনামা প্রাচ্য-বিদ্যা-বিশারদ উইলিয়ম জোনসের সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হ্যালহেদ প্রাচ্য ভাষা আরবী ও ফারসী শিখতে সুরু করেন। এই সময় বাল্যবন্ধু প্রসিদ্ধ ইংরাজ ন্যাট্যকার ও রাজনীতিক রিচার্ড সেরিডনের সাথে হ্যালহেদ এক অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

সাহিত্য সেবায় এইভাবেই তাঁর হাতে খড়ি হয়। এরপর হ্যালহেদের কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে বাল্যবন্ধু রিচার্ড সেরিডনের মতই দ্রুতগতিতে। কিন্তু সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনতুন সত্যপ্রেম হ্যালহেদের জীবনের গতি দেয় বদল করে। অক্সফোর্ড চ্যাপেলের সুকণ্ঠী গায়িকা মিস লিনলে-এর প্রেমে অধীর হয়ে পড়েন কবি হ্যালহেদ ও কবি আর নাট্যকার রিচার্ড সেরিডন। দুই অন্তরঙ্গ ছাত্রবন্ধু একই সাথে একজনকে—মিস লিনলেকে ভালবাসলেও পরিণয়ের পথে প্রেমের জয়মাল্য পেলেন কিন্তু রিচার্ড সেরিডন। ব্যর্থ প্রেমিক হ্যালহেদ তৎকালীন ইংলণ্ডের প্রথানুযায়ী বন্ধুকে পিস্তল লড়াইয়ের দ্বন্দ্বে আহ্বান না করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অতি সাধারণ এক কেরাণীর পদ গ্রহণ করে দূর বিদেশ—বাংলাদেশের উদ্দেশে ইংলণ্ড ত্যাগ করলেন। বেছে নিলেন পলায়নের পথ। ব্যর্থ প্রেমের মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে এই ভিন দেশী কবি হ্যালহেদ পা দিলেন ভারতের মাটিতে।

হ্যালহেদের মতই এই স্মরণীয় ব্যাকরণের চার্লস উইলকিনসও ছিলেন ইংলণ্ডের মানুষ। ১৭৫০ সালে ইংলণ্ডের সমারসেট-এ তাঁর জন্ম। অতি সাধারণ ঘরের ছেলে বলেই কৃতী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন সাধারণ কর্মচারীরূপে ভাগ্যান্বেষণে ভারতের মাটিতে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল।

পৃথিবীর আলোয় প্রায় একই সময়ে চোখ মেলেছেন হ্যালহেদ আর উইলকিনস। একই কোম্পানীর কর্মচারীরূপে সামান্য কয়েক বছরের ব্যবধানে দুজনেই এসেছেন ভারতে। নিজের যোগ্যতাবলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই হ্যালহেদ বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যেমন সক্ষম হয়েছেন, নিজের পদোন্নতি ঘটাতে সমর্থ হয়েছেন তেমনি স্বীয় কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ চার্লস উইলকিনসও কোম্পানীর উচ্চপদে আসীন হয়েছেন।

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান পরিচালক বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের সামনে এই সময় প্রচণ্ড সমস্যা। ১৭৭২ সালে সুবা বাঙলার শাসনভার কোম্পানীর হাতে আসার পর, বিশেষ করে দেওয়ানী কাজের ভার গ্রহণ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়েন। এদেশের ভাষা না-জানা থাকায় রাজস্ব আদায় খুব কমে যায়। তখন হেস্টিংস কোম্পানীর আমলাদের কাজের সুবিধার জন্য হ্যালহেদকে অনুরোধ করেন হিন্দু

আইনের অনুবাদ করতে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের নির্দেশে ও পরামর্শে হ্যালহেদ অটুট অধ্যবসায়ে ও নিষ্ঠা সহকারে অচিরেই বাংলা ভাষায় ও দেশীয় অপরাপর ভাষায় নিজেকে অত্যন্ত সুপণ্ডিত করে তোলেন। তারপর ১৭৭৬ সালে হিন্দু আইনের সংক্ষিপ্তসার। 'এ কোড অব জেন্টুলস' ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। এর দু বছর বাদে ১৭৭৮ সালে কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীদের এদেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য হ্যালহেদ রচনা করলেন এ গ্রামার অব বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'।

উইলকিনস হ্যালহেদের মতই ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরামর্শক্রমে এদেশীয় ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। এবং কয়েক বছরের মধ্যেই সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী মিঃ বোল্টস লণ্ডনে বসে বাংলা ছাপার হরফ তৈরীর যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাহা ব্যর্থ হওয়ায় বড়লাট হেষ্টিংসের অনুরোধক্রমে চার্লস উইলকিনস হুগলীর চার্চের কাছে এক ছোট্ট ছাপাখানায় বাংলা হরফ তৈরীর চেষ্টা সুরু করেন। দিন আর রাতের সীমিত গণ্ডীকে অস্বীকার করে বাংলা প্রাচীন পুঁথির হরফ এবং খুসখৎ মুনসীদের হস্তাক্ষরের অনুকরণে উইলকিন বাংলা হরফ প্রস্তুত করেন। এই হরফে ছাপাবার মত বই না সংগ্রহ করতে পারায় উইলকিনস খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। বন্ধুর এই প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফসলকে বাস্তবে রূপ দিতে হ্যালহেদ তাঁর রচিত ব্যাকরণকে ছাপাবার জন্য বন্ধুর হাতে তুলে দেন। "সমস্ত বাংলা অক্ষর ও যুক্ত বর্ণমালা সমান মাত্রা ও আকারে খোদাই করার অসাধ্য সাধনে আত্ম-নিয়োগ করলেন" উইলকিনস। যেমন করে হোক বন্ধু হ্যালহেদের বই এদেশীয় হরফে ছাপতেই হবে। এ ব্রতে একাই তিনি একশ'—এনগ্রেভার ফাউণ্ডার, প্রিণ্টার। একাধারে তিনি সব কিছুই করতে লাগলেন। অবশেষে সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করে ইংরাজীর সাথে প্রথম বাংলা হরফে প্রকাশিত হল হ্যালহেদ রচিত 'এ গ্রামার অব বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। উন্মোচিত হল জ্ঞানের প্রসার ও প্রচারের আলোক সরণী।

শুধুমাত্র বৃটিশ ভারতে মুদ্রণ যন্ত্রের উদ্ভব ও বাংলা হরফের প্রথম ব্যবহারের জন্যই কি হ্যালহেদের ব্যাকরণ স্মরণীয় ? নিশ্চয়ই নয়। হ্যালহেদ রচিত মোট ২১৬ পৃষ্ঠায় এই ব্যাকরণের ভূমিকা, পরিশিষ্ট ও শুদ্ধাশুদ্ধির অংশ বাদ দিয়ে মূল পুস্তকটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। Chap-I of the

Elements-Page 1-45 Chap-II of Nouns-P. 46-75. Chap-III of Pronouns P. 75-99. Chap-IV. of Verbs. P. 100-142. Chap-V of Attributes and Relations P. 143 to 159. Chap-VI of Numbers, P. 159-176, Chap-VII of Syntax P. 177-190, Chap-VIII. Orthoepy and Versification P. 190-206, Appendix, P. 207-216, Preface P-I-XXV, Errata-PXXVII-XXIX. ইংরাজীতে লিখিত এই ব্যাকরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

১) হ্যালহেদ ইংরাজী গ্রামারের অনুকরণে তাঁর ব্যাকরণের বিষয়বস্তু পরিবেশন করে অন্বয় বা SYNTAX অধ্যায়ে ব্যাকরণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন !

২) বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই সত্য হ্যালহেদ যথাযথভাবে অনুধাবন করেছিলেন বলে ইংরাজ কর্মচারীদের জন্য তিনি ব্যাকরণ রচনা করলেও ব্যাকরণের বিধিনিয়ম বোঝাবার জন্য সমস্ত উদাহরণই তিনি নিয়েছেন রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, প্রভৃতি থেকে।

৩) হ্যালহেদ ইংরাজী ভাষায় তাঁর ব্যাকরণের মূল অংশ রচনা করলেও প্রতিটি উদাহরণ ইংরাজী ও বাংলা হরফে পাশাপাশি লিখেছেন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের কাঠামোকে যথাযথভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন।

৪) এই ব্যাকরণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হ্যালহেদ অত্যন্ত যত্নের ও পরিশ্রমের সাথে ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে "দেবনাগরী, আরবী ও ফারসী এমন কি ল্যাটিন ও গ্রীক হরফের মধ্যে এক নিবিড় সামঞ্জস্য বর্তমান।"

৫) হ্যালহেদ তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় সেকালের অন্যতম একজন ভাষা-বিশ্লেষকরূপে প্রথম দাবী করেছেন যে প্রচলিত বাংলা ভাষাতেই যথেষ্ট ভাল গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব এমন কি বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়েও গদ্যের মাধ্যমে বই লেখা যেতে পারে।

৬) হ্যালহেদের ব্যাকরণে ব্যবহৃত ভাষার কয়েকটি পংক্তি—

মুনিঃ বলে শুন পরিক্ষিতেয় তনয়ঃ।
জেমতে সাথ্যকি বীর হইল পরাজয়॥

এককালে বসুদেব পিতৃশ্রাদ্ধ করে।
নিয়ন্ত্রিয়া ভাতৃবন্ধু আনে সভাকারে ॥
[মহাভারতের দ্রোণ পর্বের পংক্তি]

Mooneeh bola poree khyeetar toneye।
Jame to saatyekee beera ho'ilo poraajoya ॥
Akkaala Bosoodab peetree thraaddho kora।
Neemontreeyaa bhraatree bandhoo aana fobhaakaara ॥
[হ্যালহেদ কৃত]

১৭৭৮ সালের এই প্রথম বই বিগতকালের অচলায়তন ভেঙ্গে ফেলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারের জন্য যে স্মরণীয় ও বরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দিতে হ্যালহেদ কর্তৃক রচিত ও চার্লস উইলকিনস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত A GRAMMAR OF BENGAL LANGUAGE-এর দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে আজ নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে বাংলা বই, ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের পথে যে আলোকবর্তিকাই আগামীকালের সামনে তুলে ধরুক না কেন এই 'গ্রামার' তার প্রথম পথিকৃৎরূপে ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত থাকবে। একই সঙ্গে ঐতিহাসিক খ্যাতিতে বাংলা হরফের স্রষ্টা চার্লস উইলকিনসের নাম বার বার মুদ্রিত হবে। বাংলা ভাষায় বিদেশী ভাষা-প্রেমিক উইলকিনস ইতিহাসের অন্ধকারে হারিয়ে না গিয়ে আগামী দিনের ভাষা-বিশ্লেষকের কাছে আলোক-দিশারীর পরিচয়ে চির-পরিচিত হবেন। আর এই গ্রামারের লেখক নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেদ বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বইয়ের স্রষ্টারূপে বিগত দুশো বছর ধরে যেভাবে বন্দিত হয়েছেন আগামীকালেও একইভাবে অভিনন্দিত হবেন। ১৭৭৮ সালের এই একটি বই এবং তার লেখক ও মুদ্রাকরের উদ্দেশে কালের ইতিহাসের সমস্ত ঝড়-বাদলের মধ্যেও যেভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়ে এসেছে আজো অর্পিত হচ্ছে আগামীদিনে কি তার ব্যতিক্রম হতে পারে ?

কাঠগড়ার কারিগর

অধীর বিশ্বাস

বর্ষার সন্ধ্যে এখন রসের কড়াইয়ে জ্বাল হচ্ছে।

ফাঁকা মাঠ। তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘরে ঘরে শীতকালের মতোই নির্জন-নিঃশব্দ। নাবালের জমিতে বিঘৎ দেড়েক বর্ষার পানি। কেউ পাস হলে খাপুর-খুপুর জানান দেবে।

মফঃস্বল টাউনের এই গ্রাম। এই মাঠে প্যাঙা বারিকের ঘর। ঘর মানে পলোর আকারে শনের চাল। ঘেরা তালপাতার বারান্দা গলে লণ্ঠনের আলো ছিটকে পড়েছে উঁচু-নিচু ঢেলার মাথায়—রোয়া ধানের শীষে। রামপদ হাত নেড়ে লেকচার দিচ্ছে।

সেদিন শিব্রামপুরে ডাকাতি হয়ে গেছে। সোনাদানা আর খান ত্রিশেক দশ টাকার নোট। যাবার সময় বলেছিল—না, ওই কুকুরটুকুরের মতো গুলি করার হুমকী দেয়নি। খবরদার! চ্যাঁচাবেন না, দরকার হলে ফের আসব। এসব আদুরে কথাবার্তা মোকাবিলার জন্য মিটিং।

ভাঙাচোরা পঠে। খুঁটিতে ঠেসান হাত নুলো দাবাড়ে মাজার কাপড় সরিয়ে দাদ চুলকোচ্ছে।

কী বলিস দাবাড়ে।

বলে যাও। জবাব দিল সে চোখ বুজেই।

জয়নাল বসেছে দেয়াল ঘেঁসে। এইসব কাজটাজে অনেকটা বল ভরসা। মাঠে ঘাটে খাটা স্বাস্থ্য। প্রথম থেকেই ওর মতলব একটু ভিন্ন। কথার মাঝে বাগড়া। একটু বা মাতব্বরী না ফলালে দাম রইল কোথা ? বলে, তুই যে কী কম্মে লাগবি তা জানা আছে।

ওই জানাই বলি আমারে হিসেবের খাতায় রাখো। বিড়বিড় করছে দাবাড়ে। ইয়াকী ঠাট্টা হয় একা দোকা, তাই বলে পাঁচ মাথার মধ্যে ?

খাপুর খুপুর খপ খপ। অল্প জলে শেয়াল পার হবার শব্দে সব্বাই চুপ। তেল উঠে দপদপ করছে হেরিকেন। পনেরো জোড়া চোখ আলোর আবডালে নজর থিথিয়ে নিচ্ছে। জয়নাল কল ঘুরিরে আলো কমায়। জল পেরিয়ে কে আসে ?

প্যাঙা গেছে হুড়কোর খোঁজে। মতিগতি দেখে ছোট মেয়েটা বলল, বাবা চোর ?

মেয়ের মুখে হাত ঠেসে বারান্দায় এলে বীরেন ইশারা দেয়। চুপ যা।

নিজেদের মধ্যে গোল বাঁধলেও কাজেকর্মে সব লাঠি এক। বিবাদ তার জয়নালের ওপর। কিন্তু মাথা ঢাকা অচেনাকে জিগ্যেস করতে কী মানা ? 'হেই রামা, দ্যাখছ।' দাবাড়ে লুঙ্গি খুলে গাঁটুলী কষতে কষতে এগোচ্ছে।

কে ? বলি যায় কে ?

বাশীরাম কানে খাটো। চোখ বাদে মুণ্ডু ঢাকা গামছা দিয়ে। সামনে চালুতে তলা। তারপর সোজাসুজি সেই বরাবর। গিয়ে ঠেলে উঠবে নতুন বাজারের তরকারি হাটায়। থলেটা জমা দিলে তিনটে কড়কড়ে নোট। তাই লোকালয় এড়িয়ে এই পথে।

রাস্তার উপর জলের কুলে দুটো কুকুর পালা করে আলিস্যি ছাড়ার সুরে ডাকছে।

মাইল তিনেক ভেতরের এই রাস্তাঘাট বাশিরামের চেনা ! সে সরাসরি মাঠ ভাঙছে। হাঁক-ডাক চেঁচামেচি কিছুই কানে ঢোকে না কিন্তু।

'এই ধর ধর। হেই পলান, বেড় দিয়ে ফ্যাল। শালা সন্ধানী।' ঝুপঝাপ জল ভাঙার আগেই বাশিরাম অন্ধকারের মতন ছ'ফুটে শরীর নিয়ে ঢোল কলমীর আড়ালে চলে যায়।

বেঁউচি দিয়ে ঘুরে দাবাড়ে এখন বাশিরামের সামনাসামনি। থলে সামলে হতভম্ব বাশিরাম দেখে অচেনা মানুষ। এই বেলা বলেকয়ে কাটানো দরকার। পাবলিকের হাতে পড়লে বাঁচান নেই। 'এই ছাড়ো ছাড়ো।'

'কী সমাচার' দৃষ্টিতে দাবাড়ে হাঁফায়। হাত দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে। ইচ্ছে করেই অপেক্ষা করা।

লিকলিকে চেহারা বেঁকিয়ে বাশিরাম বলতে চায়—এই যে কান মলা। আর

না। কেননা ওই যে ঝাউঝাপসার আড়ালে আঁকাবাঁকা কাৎ হয়ে কতকগুলো মাথা দৌড়ে আসছে।

ব্যস্ত সমস্ত বাশি কুঁকড়ে যায় ক্রমশ। 'এই ভাই পথ ছাড়ো, তোমার পায় পড়ি। এ পথ মাড়াবোনি।'

ব্যাঙের আধার খাবার মতো খপ করে থলে ধরে দাবাড়ে উত্তর দেয়—চল এবার।

শেষ চেষ্টায় একবার আপোষের কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে বাশিরাম শেষমেষ এতজনের কবলে পড়বে ভাবতে পারেনি।

বাশিরাম কথা বলছে। প্যাঙার উঠোনে দাঁড়িয়ে বোঝাতে চাইছে যে লোকটাকে পয়লা ধাপে বাবু ঠাওরেছে—তাকে। 'মাল মোর লয়। দুডো রাডারে তিনটে টাঁকা। একদিন বাদ বাদ দিই।'

জয়নাল রদ্দা ঝাড়তে যায়। বীরেন হাত ধরে ফেলে। 'এই হাত তুলবি নে।' তারপর আগন্তুকের দিকে চোখ রেখে বলে, বলে যায়—তুমি তো ভাই দিব্যি খাটতে পারো।

বাশিরামের নিয়মছাড়া লম্বাই মাথা নুয়ে পড়েছে। হেরিকেন হাতে প্যাঙা বারিক। আর সব ঠাসবুনোটে ঘিরে আছে।

এমন কিছু লিখাই-পড়াই মানুষ নয় বীরেন। তবু এ অঞ্চলে ফিতে ধরে জমির মাপ-জোঁক আর ন্যাংটো বয়সের ছেলেরা তার কাছে হাতে খড়ি পায়—পাঁচজনের এক মাথা।

সব্বাইকে মন রাখতে হবে। বাশিরামের চোখজোড়া চক্কর খায়। বাঁদিকে ঘুরে বলে, তা পারি বটে। কিন্তুক কাজ কৌমনে ? গোঁড়ায় করতুন যুগীপাড়ার সেই তাঁতকলে। সুতো আকাশছোঁয়া। বন্দ দিল খটাখট। তিষ্টার ক্ষেমতি দিইলি বাবু। কনটাক্টেরবাবুর কাজ কল্লুন। সিখানেও এক জুত। বলে কিনা কোম্পানী বিল দেইনি। কুনোদিন চেক দিখায়। মোর নাম একুন জোগাড়ে বাশি।

বাশিরাম কাঁদে না হাসে বোঝা যাচ্ছিল না। বলে, দেখছেন তো জল-বাদলার দিন। একদুম কাজ লেই। তাই...

বীরেন শুনেটুনে বলে, মালটা ঢেলে ফ্যাল। ফেলে চলে যা।

না, না বাবু। বাশিরাম পা ধরতে যায়। কী ভেবে থেমেও যায়। তার মতো অশিক্ষিত জন-মজুর—একটু এগিয়ে যায়। 'তালি আজকেরে

খাওয়া হবেনি। দুদিন হলো মা-লক্ষ্মীর দানা-পানি দিতি পারিলি বাচ্চাটার মুকি। তিনটে ট্যাকা নে এক কিলো চাল নুবো। বাপধন মোর পথপানে তাইক্যে আছে বাবু।'

খবর চলে বাতাসের আগে। সেই গন্ধে বড় রাস্তার চাকীঅলা গণশা এসেছে। ভিড় ঠেলে বলে, দেখি চাঁদুর বদনখানা। সঙ্গে তার তিন চ্যালা। একবার ওপর-নিচ তাকিয়ে নিল। বাশিরামের চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। ধরতেও সুবিধে। ধরেই বোল হাঁকায়—এই শালা, সেদিন না তোরে ইছেখাদার হাটখোলায় ধরিছিল। তুই বললি আর করবো না।

জয়নালের মতো বীরেন এবার বাঁধা দিতে পারে না। কেন জানি ওর স্বভাবে অনেকেই এমন চুপ যায়।

বাশিরামের চুলধরা চোখ মাটির নিচে। মুখে রা নেই। এমন ভাব 'কই আমি তো না!' অথবা 'করিছিলাম,' এই দুটোই অর্থ। তার কোন্‌টা ভেবে গণশা বাম করে এক ঘুষি মারল। বলে, কী রে চুপ ক্যান? দেবো এক্ষুনি—ফের চুপকী বাগাতেই বীরেন হাত ছাড়িয়ে দেয়। বাশিরাম বুড়ো আঙুল ঘষটে ঘষটে মাটি খুঁড়ছে। নজর সেইদিকে।

গণশার সাঙাতরাও বুঝি তাদের উপস্থিতির নমুনা রাখতে চায়, নগনার পাঞ্জা পেটোয় গেছে থলি ফাঁক করে। ভ্রূ নাচায় লোলুপ কায়দায়। হিস হিস দুবার গন্ধ শুঁকে ট্যারা চোখে গণশার দিকে কী এক হুকুম মাফিক তাকাতেই গণশা সবার অলক্ষ্যে পা টিপে দেয়। 'ওকে ক্লাবে নিয়ে চ।'

সেই ভালো। বীরেনেরও এক কথা।

প্রহরের পর প্রহর। গড়িয়ে যায় নিঝুম রাত্তির। বিরক্ত হয়ে অনেকেই এখন ঘরে ঢুকে গেছে। তেপায়া টেবিলে বাতি জ্বলছে। রামপদ আর জয়নাল গায়ে গা ঠেকিয়ে গুজুর-গুজুর গল্প করছে। এখানেও ওই একই সংকোচ। বেঞ্চিতে বসতে বাশিরামের মন বাঁধা দিয়েছে। পাছায় ইঁটের থান।

মোমের আলোয় বাশিরামের মুখ থমথমে বোবা। একজন পথচলতি লোক বলল 'ও তো তাঁত চালায়। এর মধ্যে আবার এই কারবার?'

বাশি বলেছিল আস্তে আস্তে, না বাবু, কাজ লেই।

'শালা ভক্কি দিচ্ছে' বলেই লোকটা চলে গেছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। ব্যাঙ ডাকছে। ডাকছে না কেবল শেয়াল। কেননা এখন যে বর্ষার সিজিন।

ওই যে দুজন ব্যাঙ-ধরা হ্যাজাক নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। সেই আলোয় দেখা গেল বাশিরাম ঝিমুচ্ছে।

ও এখন ঘুমোয়, না নিজের মনে দাঁড় পাকাচ্ছে ভবিষ্যতের চিন্তায়—কে জানে? কিন্তু ওদিকে যে ঘুমন্ত ছেলে পাঁচ বছরের রামগোপালকে নিয়ে অচলা রাস্তায় বসে মশার কামড় খাচ্ছে—সেই কথা মনে করেও তো ছুট দিতে পারে। না, বেইমানী কেন? ছাড়া পেলেও ট্যাকা পাবে না। তাছাড়া বাচ্চার কান্নাকাটি, খাই খাই আর সহ্য হয় না ছাতা। অসাক্ষাতে যা ঘটে ঘটুক—সব গরীবের এক ভাবনা। বাশিরামেরও এই কথা।

বাশিরামের কথা দিশি মালের কারবারী ভাদন জোয়ারদারের মনে পড়েছিল সেই নিশি রাতে। একঘুম ঘুমিয়ে বুকটুক টান করে গতলব এল মেয়েছেলের দয়ায় হয়ত মালটা উদ্ধার হবে। অতএব কালার বৌ অচলা। সেই পরামর্শে মায়পুতি সক্কাল সক্কাল রওনা দিল।

চড়চাপড়ের মতো বৃষ্টি নেমেছে। ঝলকে ঝলকে হাওয়া। এক ছাতায় বীরেনের সঙ্গে প্যাঙা। ক্লাবের সমুখে এসে রাগ নয়, কেমন এক অস্বস্তির দায়ে বাশিরামের দিকে তাকায়। ইশারা পেয়ে জয়নাল নামে রাস্তায়।

কী ব্যাপার?

বীরেন মণ্ডল ক্লান্ত ঘুম জড়ানো চোখে বলে, আস্তে।

গণশার মতো আরও সব খবর পেয়ে গেছে। ছাড়া যাবে না। চিন্তা-ভাবনা অনেক করে কিনারা পায়নি। তাইজন্যেই থানায় গেছিল। জয়নালের চোখে বিস্ময়।

দূর নয়, কিছু দূরে বেল বাজতেই প্যাঙা হাত আগলে সাইড নেয়। ঘন হয় তিনজন। ছাতার তলায় পরামর্শ। বীরেন বলে, থানা থেকে বলল—এক সাইসে ফোন করে ভ্যান পাঠাচ্ছে। কেস যেন মোবাইলে না যায়। ওদের সঙ্গে নাকি হিস্যার ব্যাপার।

আরে? প্যাঙা অপার আশ্চর্যে দেখে একটা মেয়েছেলে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে ছাঁচের নিচে। বীরেনও রীতিমত ঘাবড়ে গেল, তাই কথাবার্তা সব আপাতত করে এরা ক্লাবমুখো হয় পায়ে পায়ে।

দেখতে দেখতে আসে—এই এতটুকুন এক বাচ্চা বাশিরামের কোলে

ঝাঁপিয়ে উঠেছে। হাড্ডিসার গায়ে ছেঁড়া সোয়েটার। বৃদ্ধ রোগীর মতো পাছার চামড়া ঝুলে পড়েছে। সে বলছে সামনের দোকানের টিনে সাজানো রুটি দেখিয়ে—বাবা, ও বাবা উটি খাবো।

অচলা আঁচল চাপা মুখে কাঁদছে। ভাবছে কী হবে? গোপালকে নিয়ে কী খাবে এরপর—অচলা ঘরের মধ্যে যেতে পারে না। বুঝতে পারে এই মুহূর্তে তারা সমাজের দুই ভিন্ন মানুষ। কাঠগড়ার জীবন ওর। সম্পর্ক শুধু—এ জগতের বাইরে যেখানে শুধুমাত্র এই চোখের জলের সঙ্গেই তার সহবাসের সম্পর্ক—অন্তত কিছুদিন।

• কবিতা

বিনোদ বেরা

মনের আড়ালে

আশ্চর্য রয়েছি বেশ ভুলে
একদিন যার জন্যে মন
সব পাপড়ি দিয়েছিল খুলে
এখন তা একান্ত নির্জন!

উত্থান পতন অবক্ষয়
অধ্যুসিত এই পৃথিবীর
জীবনে বিস্মৃতি মোহময়
কেউ কোনো কেন্দ্রে নয় স্থির।

তবে এই মেনে নেওয়া ভালো
সব দৃষ্টি শ্রুতি ও সৌরভ
একদিন হয়ে যায় কালো
রয় শুধু বাক্যের গৌরব!

সুখ তৃপ্তি প্রেম বা ঈশ্বর
চোখের আড়াল হলে হায়
নিভিয়ে সকল কলস্বর
মনের আড়ালে চলে যায়!

রণজিৎ দেব

দুরন্ত পাখির ডানার ঢেউ

আহা, দুরন্ত পাখির ডানার ঢেউ
বলয়িত হয় বুকের গভীরে
আলতো সে মুখের ছায়া সারাক্ষণ
ভরা রোদে ভুল ছন্দে ভুল কবিতা

ছোট্ট পাখির বাসায় একবিন্দু ডিম
আহা, কোথায় গড়িয়ে যাই
হিমেল হাওয়া অচেতন ঘুম সারাক্ষণ
দুরন্ত পাখির ডানার ঢেউ

সুশীল পাঁজা

একটি অপরিচ্ছন্ন কবিতা

অনেকে বাঁচার আশায় ঘুরছে পৃথিবী
এবং শহর কোলকাতায়
এম্পলমেন্ট এক্সচেঞ্জে দাঁড়াই আমি
সাহসী যুবকের পাশাপাশি
মুখে সস্তা সিগারেট কিছুটা স্মার্ট
আনি নিজস্ব শরীরে
দূরে অগোছালো সংসার ভাসে
গ্রামের মানুষের
এদের শিশু কন্যাটি আজ ফুটপাতের ভিখারী...

আমার সামনে পিছনে অনেক যুবক
উজ্জ্বল চোখ উদ্‌ভ্রান্ত শরীর
দীর্ঘদিন নির্বাসিত প্রবাসী যুবক আমি
স্বপ্নের ভিতর হাঁটা পথে দেখি,
মায়ের জীর্ণ শরীর...ছোট ভাই
পিতার সঙ্গে চলেছে মাঠে পুরনো কোদাল হাতে
এ সময় আমার কাছে কোলকাতা ধ্বসর
নিজেকে বিদ্রোহী বলে মনে হয় তামাম শহরে.....

রক্তে গোপন খেলা

১
রক্তের ভিতর তার গোপন খেলা এইভাবে সে
মধ্যাহ্নের জামার সুতোয় ঝুলিয়ে রাখে পরিচিত মুখ
ভালোবাসা পাখির নীল পালক এবং বয়সের হিসেব

খেলা তার রক্তের ভিতর
২
শব্দের ভিতর দিন এবং রাত এবং ছোট হয়ে আসছে
এইভাবে একদিন ক্রমশ পাঁচিল ভেঙে উঠোনে
এসে দাঁড়াবে রাজবেশে মৃত্যু বড় বেশী অনড়
দীর্ঘ হাতে থামিয়ে দেবে হৃৎপিণ্ড

খেলা শেষ মঞ্চে আলো নিভে যাবে
আবার জামা বদল হবে খেলার মন্ত্র

৩
জমাট রক্তের ভিতর শুয়ে থাকবে খেলা তার

শাশ্বতী দেবনন্দী

স্রোতস্বিনী নদী

অশান্ত হৃদয় নিথর নিস্তব্ধ চতুর্দিক
বয়ে চলেছে একটি স্রোতস্বিনী নদী
এঁকেবেঁকে অসমান একটি রেখার মতো
কোথা থেকে আসে, সে কি ছিন্ন স্মৃতি
কোথায় যায় সে কি প্রবাস
কেউই জানে না।

আমার অশান্ত হৃদয়
কখনো নেচে ওঠে আনন্দে
কখনো গভীর মমতায় বিষাদ
হাসি কান্নারই মাঝে ঝরে পড়ে
দুফোঁটা অশ্রুজল,
ব্যথা বেদনায় ব্যাপ্ত হৃদয়
খোঁজে ওই একটিই স্রোতস্বিনী নদী
যেখানে পারি নিজেকে ভাসিয়ে দিতে
কিংবা মমতাময় এ ঘর থেকে নির্বাসন।

অশান্ত হৃদয় নিথর নিস্তব্ধ চতুর্দিক
বয়ে চলেছে একটি স্রোতস্বিনী নদী।

শতদল দত্ত

তখন ধূসর

বর্ষা ঋতুর বিকেলে
যখন মেঘের চিত্রণে
আকাশে শিল্প হয়
তখন গহনে
হু-হু করা উদাসী বাতাস
আর রিমঝিম বৃষ্টিতে
স্নাত হই।
নিষ্পাপ মনের অলিন্দে
উঁকি দেয় কারো কারো চেনা মুখ
চেতনার ঠোঁটে কাঁপুনি ওঠে
শরীরের রক্ত হিম হয়
রোদহীন অপরাহ্নে
জলীয় দুঃখ ভেসে যায়
কাঙ্খিত ছায়াতট
দৃষ্টির অঙ্গনে তখন ধূসর।

উল্টো

যে কোন দুপুরে তুমি বললেই চলে যেতে পারি
যে কোন সন্ধ্যায় রাত্তিরে
ভালই তো হয় স্বাদের বদল এমন ঘুরে
তুমি বললেই চলে যেতে পারি।

একটা বছর এক হরিণী অনেকভাবে আঘাত দিল
কেড়ে নিল কিশোরকালের লাটিম
ধীরে তার কাছ থেকে উঠে এসে
তোমাকে আমার পাশে দেখলাম।

এর পরেও কি বলবে তুমি
আমি নিয়ন্ত্রণ মানি না বলেই
এখন আমার সময় হয়নি
ভালবেসে বলই যদি নির্বাসনেও সুখ আছে
না—নির্বাসনে আসা ফিরে? কেউ কি আসে?

তুমি বললেই চলে যেতে পারি, কবিতা, তুমি
বললেই কোলকাতা
সমঝে নিতে দুনিয়াটা ঘুরেই আসি কোলকাতার ঐ ঘন শ্মশান
সৎ হয়েছো কি লাথ খেয়েছো এমন উল্টো কোলকাতায়
ঘুরেই আসি, বলে আসি; কোলকাতাকে ভালবাসি।

মবিনুল হক

নিহিত অর্থে

'নিহিত মানেই হল একটি গোপনতম বৃক্ষের হুংকার'
বললো আমার বন্ধু সুজন অসিত
'তুই তোর দশকেই সেঁটে থাক মবিনুল,
আমি শালা তোর দুঃখে বানে ভাসবো কেন?'

নিহিত শব্দের অর্থে কাতর কুমারী
বেমক্কা চুমো খেলো অসিত
রাঙা চুড়ো থেকে তার পিরীতের মেয়েটির গালে
সেখানে নিহিত অর্থে পর্ণব বিন্যাস
খাজুরাহো মন্দির দেয়াল, কলা ও কৌশলে সেঁটে থাকা।

'নিহিত অর্থে আছে আরো পাঁচজন'—বলতেই
সে তখুনি রুখে আসে, হামলা চালায়
জুড়িদার বলে সে আমায় এক হাত
দেখে নিতে কসুর করে না।

অমিত কাশ্যপ

হারিয়ে যাবে

যা ছোঁবে তা হারিয়ে যাবে
মুছে যাবে মায়ার মুখ
মাখবে রাত রাতের হাত
ধরবে চির সুখ সুমধুর।
আর যা আছে জলের জিনিস
মানায় ভালো পাড়ে এসে
দূরের খেলা স্বপ্ন সাধ
বালির পাহাড় ক্ষণিক ভালো,
এর জন্যে কাছে গিয়ে
জরিপ করা প্রেমের জমি
স্বাদবিহীন অন্ধকার সব
মিলিয়ে যায়, এই এক্ষুনি

মুকুল চট্টোপাধ্যায়

জল চলে এলো

এভাবে কতকাল জল চলে এলো, ঋণার কাছে তোর
ভ্রাম্যমান অবধূত, কি কথা ? কেমন কথা ?
আবারও জল এলো, ঘুমো সখী, কি কথা ?
কিসের কথা ? জ্যোৎস্নায় স্বরাজ এলো, স্নান কর
স্নান সেরে বল, সে কার কথা……তারপর চুপ।

এভাবেই কতবার জল চলে এলো, কোকিল মরেছে বউ
তোর কোল আলো করে কেউ কাঁদুক, কেঁদে উঠুক
নচ্ছার পতিগৃহে রাক্ষুসে শ্বাশুড়ীর মুখছিরি—

তবু, ফের জল এলো, কতকাল কাঁদিসনি বউ…

অমল দেব

ঈশ্বরের কাছে

নতজানু হয়ে তিনবার ভিক্ষা প্রার্থনা করেছি
কৈশোরে একবার ঘোড়দৌড় দেখে
জ্যোতিষীর কাছে একটা পরশ পাথর চেয়েছি
যৌবনে একদিন অলংকৃত চাঁদ দেখে
আমার অগ্রিম ঐশ্বর্যকে দুর্গে জমা রেখেছি
বার্ধক্যে আমার আলোকহীন বোনা চারাগাছ
নতজানু হয়ে তিনবার ভিক্ষা প্রার্থনা করেছে
ঈশ্বরের কাছে।

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী

ভোরের পাখী নেই

অর্গল বন্ধ, কিন্তু সান্ত্রীরা উধাও।
শুধু অন্ধকারের প্রচণ্ড একটা চেহারায়
পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি আঁকা। জীবিত না মৃত ?
কেউ জানেনা এখন কেননা এখনো ভোর হয়নি।

জীবিত হলেও ঠাঁই নেই যেহেতু দুয়ার বন্ধ
বাতাসের প্রবেশাধিকার সেখানে নেই।
মৃত্যু হলে আরও বীভৎস এবং আরো ভয়ঙ্কর—
যেহেতু এক্ষুণি পচন শুরু হবে ঘরের ভিতর,
তবুও কয়েকটা কঙ্কালের প্রত্যাশায়,
ডজন দুয়েক শকুন এখানে ওখানে উড়ছে—
তুমি আর আমি সেই শব্দকে ভোরের পাখী ভেবে উৎসাহিত,
প্রভাত আসবে জেনে অনুপ্রাণিত।

সময় পেরিয়ে বেলা বাড়ছে,
দুর্গন্ধে বাতাস হয়েছে ভারী।
এই প্রচণ্ড অন্ধকারের হাত থেকে মুক্তির কোন পথ নেই।
ভোরের পাখীরা উধাও, এই দিগন্তে এখন প্রায়শ্চিত্তের পালা॥

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

লাল সিগ্‌ন্যাল পেরিয়ে

প্রবাসী
ঘরে ফিরতে চায়—
ঘর
সবুজ সিগ্‌ন্যাল পেরিয়ে—
প্রবাসী
ঘরে ফিরে আসে—

ঝড়
হাওয়া আর হাওয়া—
ঘর—
অন্য কারো হাত ধরে
অন্য কোথাও—

প্রবাসী
আবার ঘরে ফিরতে চায়—
সবুজ সিগ্‌ন্যাল
যতদূরে—
লাল সিগ্‌ন্যাল পেরিয়ে
ততদূরে—

মাণিক চক্রবর্তী

মৃত দাদার ছবি যখন কথা বলে

বেশি রাত জাগলে পিপাসা বাড়ে
জানিস না ?
একটু আগে দেখলাম
কাকে বললি—এক ঘটি জল রেখে যেতে ;
আর কি করতে রাত জাগছিস
একা-একা ?
জানিস না—রাত জেগে কিছু হয় না,
শুধু ব্যবধান বেড়ে যায়
টিকটিকির পেছনে টিকটিকি দৌড়য় ঃ
আলোর বাতি ম্লান থেকে ম্লানতর আলোর কংকাল
ও অজস্র টিকটিকি হয়ে মূর্ছা যাবে শেষে ;
এ যে আমারই মত তোর চোখে ঘুম আসছে না !
দু-চোখ জুড়ে বিষ,
হাত-পা নাড়ালে কিছু হয়
বোকা ?
রাত কতো বড়
কতো ভয়ংকর ;
হাত-পা নেড়ে কোনো সুখ নেই,
মাণিক !
দেখবি সাদা পোকাদের মৃতদেহ ঠিক
কালো পিঁপড়েরা টেনে নিয়ে যাবে,
ধরতে পারবি ?

পঙ্কজ সাহা

পায়ে মুখ রেখে ছিঁড়ুক দু'ধার

ভাঙা ডালে নেই ডাকছে পাখি
মরা মুখ তার দেখবে নারে
উল্‌টে দে তোর দুধের বাটি
ভালোবাসা থাক বাহির দ্বারে

আঁখিভরা দুই আঁচনকণা
অলখ দুখের শতক বোনা
করতল থাক গুম্ফছায়ে
পায়ে মুখ রেখে ছিঁড়ুক দু'ধার
ভেঙে যাক একা এই পরপার।

বিপ্লব চন্দ

কবর খুঁড়ি

যে নদীতে স্রোত নেই, তার বংশ ও সন্তানাদিতে ঘুম
যে ঘুমে স্বপ্ন নেই, তার মৃত্যুর আশঙ্কা সহজ।

চণ্ডালিনীর মাথায় যদি সর্প খেলে, খুনের উপর
নষ্ট বীজের লাঙল চলে
নিশ্চিত তার উন্মাদনা, রক্তে ফেরা, ছিন্ন এবং
বিচ্ছিন্নতা
সেই নদীতে স্রোতও নেই, সেই ঘুমেতে স্বপ্নও নেই।

ধার ধারে না রাজনীতিতে, সমাজ-টমাজ অন্য কিছু
কিংবা পাশে খুনের লাশে
বাজার চড়া, উধাও ভাতে এবং কোন আকাল এলে

এমন মানুষ দেখি যখন
আঁতাত করা শ্মশানচারী, ইচ্ছে করে
কবর খুঁড়ি, কবর খুঁড়ি
নষ্ট ধুলো মাটির তলায় গুমু করেছি।

ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

ধীরে এসো শূন্যতা

ধীরে এসো, পুরানো ছবির গা ঘেঁসে ধীরে এসো শূন্যতা
রাতে বাড়ে, বিশাল আকাশ থেকে নক্ষত্র পালায়
বস্তিবাড়ীর পাশে রাত জেগে বসে থাকে মা
স্বর্গের সোপান থেকে প'ড়ে গেছে শিশু তার
পরমা যন্ত্রণা, বিদ্যুৎ-এর ব্যথা নিয়ে
পালিত পশুর মত চেয়ে আছে
ধীরে এসো শূন্যতা, পুরানো ছবির গা ঘেঁষে ধীরে এসো।

আমাকে খুঁজেছো তুমি বহুদিন
আমিও চেয়েছি তোমায় শাশ্বতঃ কাল,
গোলাপের মাঠ ভেঙে বিষাক্ত ফুলের কাঁটায়
তোমার শাড়ীর পাড়, ছিঁড়ে গেছে বহুদিন
নিয়তির কণ্ঠস্বর চুরি করে আমাকে দিয়েছো অস্ত্র
দিগন্ত দু'ফালা করে ভোরের রোদ্দুর যেন এনে দিতে পারি।

আয়ুহীন হরিণের মত আজও চেয়ে আছো
বটের শাখায়,
লাল কারে বাঁধা শ্বৈত হৃদয়, পুরানো পাথরে রেখা
যেন লেখা হ'য়ে আছে—
ধীরে এসো শূন্যতা, পুরানো ছবির গা ঘেঁষে ধীরে এসো।

পার্থ মুখোপাধ্যায়

আছি প্রতীক্ষায়

প্রমিথিউস ঃ আমায় উদ্দীপ্ত কর।
আজও অভাব
বাতি জ্বালাবার জন্য একজন
মানুষের।
শত ঝাপ্টাতেও অটল দাঁড়িয়ে
যে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে
হাতে আগুন ॥

পৌষের দারুণ শীতেও
হৃদয়ের উষ্ণ ওমে
তাজা রাখবে অসংখ্য হিমেল অস্থি
অমন—ঠিক অমন একটি বাতিওয়ালা
আমরা চাই ॥

প্রমিথিউস ! জিউসের স্বর্গ থেকে
চুরি করা আগুন
বয়ে আনা উত্তপ্ত উজ্জ্বল
মানুষ—
একটি সত্যিকারের মানুষ
তুমি আমাদের দাও ॥

আকুল আগ্রহে
সম্মুখ সারির দিকে তাকিয়ে
অপেক্ষমান আমরা—
আগুন জ্বালাবার মত একজন
বাতি-ওয়ালাকে চাই
বুক থেকে উপ্ড়ে আনা কল্জের রক্তে
যাকে বরণ করে নেবো ॥

স্বপন রায়

মধ্যরাতে শব্দেরা

মধ্যরাতে শব্দেরা হাততালি দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়
একটার পর একটা গলি টপকে
ফুটপাথ ধরে হাঁটে কখনও হঠাৎ ঢুকে পড়ে
সাতমহলা বাড়ীর দালানে দু-চারটে সিঁড়ি
টপকে ঘুরে বেড়ায় সমস্ত ঘরে বারান্দায়
এবং ছাদে।

মধ্যরাতে শব্দেরা মুখর হয়
ট্রেন এবং স্টীমারের ভোঁ হ'য়ে নিঃশব্দে
ঢুকে পড়ে ঘুমন্ত মানুষের মাথায়
শব্দেরা উন্মত্ত হ'য়ে ওঠে জাজ্-সঙ্গীতে
সমস্ত মানুষের ঘিলু স্নায়ু জুড়ে
কোষ থেকে কোষে ছড়িয়ে পড়ে অনবরত।

মধ্যরাতে শব্দেরা ঘুমন্ত নারীকেও দুঃস্বপ্ন দেখায়
বিছানা থেকে নামিয়ে দিয়ে শব্দেরা
টুইস্ট নাচে খাট ঘর এবং দেয়াল জুড়ে !
মধ্যরাতে শব্দেরা কাঁটাতারের বেড়া টপকে
ফাঁকা সড়কে এসে দাঁড়ায় ঘুমন্ত মানুষকে তুলে
সিটি দ্যায় দুর্দাম ব্যাণ্ড বাজায় বিরতিহীন
বাঁশি কিম্বা বেহালাও বাজায়
মধ্যরাতে শব্দেরা…

অনীশ ঘোষ

বর্ণপরিচয়

বাঁকা কটাক্ষে চিকচিকে রোদের ছটা নিয়ে
ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে লাবণ্যময়ী দুঃখ
আশেপাশে খালি পায়ে চতুর তস্কর
এবং ফালুক ফুলুক দৃষ্টিপাত অস্থানে কুস্থানে।

কবে যেন ঈশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন
কোন এক অতি রমণীকে
'তুমি তো আমার মা হও, আমি তোমার সন্তান'
মধ্যরাতে মাতালের অপভ্রংশ স্মৃতির মতো
বর্ণহীন কিছু শব্দ চেয়ারে টেবিলে
দক্ষিণেশ্বরের চাতালে,
এবং চোরাগোপ্তা দৃষ্টিতে অস্থানে কুস্থানে।

প্রদীপ আচার্য

কুঁড়ি ঃ ৫

১. হাজার গুণ ভালো আমার
খেই হারানো হাসি
হোক্ না অগোছালো
বুকের জমাট জ্বালা
আঁধার করা কালো!

২. হাজার গুণ ভালো আমার
তোমার চোখে চাওয়া
যতই না বিষ ঢালো
শুকনো পাতায় চলা
হাজার আগুন জ্বালো!

৩. হাজার গুণ ভালো আমার
প্রাণ খুলে গান গাওয়া
ছড়িয়ে পড়ুক আলো
তড়িৎ ছুঁয়ে থাকা
যথেচ্ছ ঝলকানো!

বিনতা শাহীন

তিনটি কবিতা

১.
বৃক্ষ বললে চেতনায় ভেসে ওঠে
সবুজ পত্রাবলী শোভিত
ছায়া ছায়া সুমিষ্ট কিছু,
নদী বললে দু' তীর মধ্যবর্তী
প্রবহমান স্রোতকথা!

তুমি কোন্ চেতনায় দাঁড়ালে এসে?

২.
এখন কতক প্রশ্ন থাকে
যার জবাব দিতে নীলিমার
নাভীমূলে দাঁড়াতে হয়,
এমন কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে
যার উত্তরের খোঁজে নিটোল জ্যোৎস্না
কিংবা নদীর পরতে ডুবতে যেতে হয়;

তুমি যখন প্রশ্ন করলে
তখন আকাশ-জ্যোৎস্না-নদী
কিছুই আমার সহায় ছিলো না!

৩.
সব সৃষ্টির মূলেই নাকি ব্যথা থেকে যায়!
বীজ যেমন মাটির চিৎকার বুকে রেখে

নীলাদ্রিভূষণ হরিচন্দন

ভাঙা মন্দির

কোন দুঃখে আবার
ভেঙে পড়ল
পরিত্যক্ত মন্দিরটির
হাজার বৎসরের সাহস ?

নির্জন বনভূমি
ধরে রাখতে পারলো না
মন্দিরের গায়ের যাত্রীদের
হাতের লেখা কিংবা ইতিহাস।

বন্ধ মন্দিরের ভেতরে
শুয়ে আছে চোখ কান বুজে
ছেঁড়া ময়লা পাঁজির পৃষ্ঠাগুলি
মাঝে মাঝে ঝড়ে পড়ছে
বালি পাথরের গুঁড়ো আর চুণ।
বাতাস নেই
কে লিখছে ?
কে আবার বারংবার উল্টাচ্ছে পাতা,
মন্দিরের গায়ে শব্দ করে জিজ্ঞেস করে
পুরাতন শালগাছের ঝরাপাতা
কে ? কে ?
কে জেগে আছ এ নিশিরাতে
শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো ।।

রাজকুমার

কি জানি কেমন করে

দু'হাতে ঢেকেছ মুখ
মুখের পেছনে কাঁপে ছায়া
ফেলে আসা দিনের মতন
তারও পিছে বাজে শাঁখ
হুলুধ্বনি
সানাইয়ের বিষণ্ণ আলাপ ঃ

মিছেই পেয়েছ ভয়
ফুরালে সময়
এখনি ফিরিয়া যাব আমি ;
কেমন আশ্চর্য তুমি
একমুঠি তণ্ডুলে
শোধ কর আজন্মের ঋণ ঃ

পড়েছে কি যে গরম
আর ত সয় না
বৃষ্টির বুলেটে গরম নিপাত যাক
আমার এ-কথা মেঘেরা শুনবে কি
ওরা ঠিক জানে ওদের জিরো সময়

বৃষ্টি হলে হত
বৃষ্টি হল না, দিন যে কেটে গেল
এখন আকাশে
কোথাও নেই ত মেঘ
মেঘেরা গেল কোথায়
আকাশ স্পষ্ট—এমন নীল জ্বালা
দেখিনি কখনও
বৃষ্টি কবে হবে
জানি না, জানি না
সব মেঘে ত বৃষ্টি হয় না
যে-সব মেঘেরা ঘটাবে বিপ্লব তারা যে রয়েছে
এখনও সুদূরে।

দীর্ঘদিন পরে

দীর্ঘদিন পরে আমি চমৎকার আছি লিখেছেন তারাপদ,
দীর্ঘদিন পরে সকালের সকাল দেখতে পাই, বিকেলের বিকেল,
দীর্ঘদিন পরে আনার তামার আটিংট ঝক্‌ঝক্‌ ক'রে উঠছে,
আমি ভাল আছি।

এই প্রথম আয়নায় নিজেকে কেমন লাগে দেখতে দেখেছি,
এই প্রথম বন্ধুদের কাছে চাইবার মতন আর কিছু নেই।
এই প্রথম আমার বন্ধুত্ব দেবার মতন সাহসী তৈরী হোল,
মুখোশে ধুলো জমছে আমার!

দুইহাতে অগ্নিপিণ্ড লুফতে লুফতে আমি ভেসে যাই
বাসের জানালায়,
চোখের অন্তরালে অর্ধনিমীলিত মুখ দিয়ে
আবৃত ক'রে রাখি সেই তীক্ষ্ণ লোভ,
জীবনের বিনিময়ে অর্জিত ব'লে সহ্য করতে
পারবে না কেউ, এমনকি আমি নিজেও।

মানসী

মানসী, তুমি প্রথম যৌবনের কুসুম ফোটার কালে
পৃথিবী বাগান থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিলে একটা সুন্দর ভালবাসাকে,
বুকে নিয়ে তাকে নিজ চেতনার রঙ্গে রাঙ্গিয়ে তুলেছিলে,
হৃদয় থালায় প্রেমকে সাজিয়েছিলে রঙ্গীন ফুলে,
মনের গভীরে ভালবাসার প্রদীপ জেবলে
তাকে তোমার অস্তিত্বের সাথে একাকার করে নিয়েছিলে,
কিন্তু একদিন গোধুলি বেলায় তোমার অসাবধানতায়
তাকে হারিয়ে ফেললে দূরে বহুদূরে,
ব্যথিত মনে দূরে থেকেই তার অস্তিত্বকে গেঁথে রাখলে
নিজের মত করে হৃদয়ের গভীরে।

জলাভূমি তচ্‌নচ্‌ ক'রে গ্যাছে বিদেশী ট্যুরিষ্ট

অরণ্যে গেলেও তুমি প্রার্থিত খবর
কোনোদিন প্রত্যাশা কোরো না।
গাছগাছালির স্বতঃ নিয়োজিত ভীড়ে
কাঙালীর মতো প্রতিধ্বনি
পাখির পাখালি ছিঁড়ে দেয়। তুমি
কালজানী নদীর পাড়ে
নিমাতির ময়ূর নিবাসে
ছিন্নভিন্ন ডানা দেখেছিলে!
তোমার বুকের রক্ত ফোঁটা ফোঁটা, ধুলোয় জমাট,
তার ঘ্রাণ নিয়ে চিতাবাঘ, চিতল হরিণী
বহুদূর পায়ে হেঁটে এসে
সবুজ কটেজ থেকে ফিরে গিয়েছিল
জলার ওপারে!
চুক্‌চুক্‌ চুক্‌চুক্‌ শব্দে
ভয়ানক নির্জনতা সংগ্রহ ক'রেছে পাগলা ঝোড়া।
ট্যুরিষ্ট হাওয়ার মধ্যে স্মৃতি কাঁপে
কি জানি সে ন্যুডিষ্ট বিস্ময়—
শালের জঙ্গলে আজ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে
ডুয়ার্স—নৈঃশব্দ—মনুমেন্ট—,
প্রার্থিত খবর নেই
জলাভূমি তচ্‌নচ্‌ ক'রে গ্যাছে বিদেশী ট্যুরিষ্ট।

বিদ্যুৎ ভৌমিক

যুধিষ্ঠির

সবাই চলে গেছে
শুধু আমিই শান দিচ্ছি ভোঁতা তলোয়ার
সমুখেই রণক্ষেত্রে মানুষ খেলছে স্বার্থের পুতুল
মনে নেই অস্ত্রবিদ্যা, রণকৌশল, গুরুর দেওয়া সত্য উচ্চারণ
মনে পড়ে 'সদা সত্য কথা বলিবে'
নগ্ন সমাজে কি বেঁচে থাকার বিকল্প উপায় আছে
সব কিছু ভুলে যাওয়ার মাঝে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে মনে পড়ে

ঘুম

শব্দ, বাক্য, ভঙ্গি, বোধ—সমস্ত বদ্‌লায়।
মালতীলতায় কিন্তু ঘুমন্ত চড়ুই
রাত্রিকে রাত্রিই মেনে খোলেনা দু'চোখ,
হঠাৎ দেখলুম জানলা খুলতেই—দেয়ালে।

সে রাতদুপুরে ঘরে জ্বলছিল আলো
পুলিশের বাঁশি ছিল অনেকটা দূরে
চাঁদ ছিল রাঙা-ডাঙা শূন্যে ছিল মেঘ
মানসিক অলিগলি সর্বত্র উদ্বেগ।

কখনো পড়িনি রাত্রে কী লেখা দেয়ালে।
মানুষ কী ঘুমহীন ছিলনা খেয়ালে।*

* শ্রীশিশির ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'অন্যদিনের কবিতা' (১৩৮৫) বইটির ৬৪ পৃষ্ঠায় শ্রীহরপ্রসাদ মিত্রের 'এক ফোঁটা কবিতা'র ষষ্ঠ ছত্রে 'লিখে না' হবে 'লিখো না' এবং অষ্টম ছত্রে 'নয়' শব্দটি হবে—'শব্দের সাধ্যই নয় সারানো সে ভোগ'। এই ছাপার ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত।

মানস রায়চৌধুরী

তিনটি স্তবক

আহত, আধখোলা দুটি ঠোঁট
দানব তৃষ্ণায় রাখে বক্ষ বৃন্তে মুখ
মৃত্যু কি দিয়েছে তাকে বাসনার এমন অসুখ?

কেমন সহজভাবে রাত্রি করে মাথায় শুশ্রূষা
ঘুম ভাঙে অনিবার ঊষা
দুটি ঠোঁটে আসক্তির মধু ঢেলে যায়

মৃত্যুর স্পন্দন যেন তীব্র মমতায়
গ্রাস করে দয়ার্দ্র শরীর—
গড়ে ওঠে মিলনের পটভূমি—দৈত্য ও পরীর।

শ্যামল বসু

তুমি | আমি

নিঃশ্চিন্ত বিলাপে
সময়,
অহংকার টুকরো করে
বিপন্ন আশ্রয়।

কোথায় দাঁড়াবো বল
ভরাডুবি রোদ,
কোলাহল আশ্রয় হবে
কোন কিছু নয়।

ধীমান চক্রবর্তী

দিতে পারো

আমি একটা বুকে মাথা রেখে কান পেতে
শুনতে চাই—এখনো ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ
বয়ে যায় কিনা। বোলেছিলো আমায় কেউ
হৃদয়েরা সব গাছ হয়ে গেছে। শীতের গাছ।
সবুজ পাতা নেই হলুদেরো সময় পার হয়ে গেলো।
ছুটন্ত আকাশ দেখে—মানুষের সাথে
কথা বোলেও আমি বুঝতে পারি না, কোন ঋতু
প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা রেল এখন, আমার
ঘড়ি শোনার ইচ্ছেটা ভয়ানক প্রবল হয়ে উঠেছে।
একটা বুক আমায় দিতে পারো? যেখানে মাথা রাখবো।

সত্যাদেশ আচার্য

যাওয়া

কেন এমন হয়—

স্থির প্রশান্ত অমৃতলোকে
অবসন্ন বিবর জন্ম নেয় মাটির বুকে
পড়ন্ত বেলায় লালচে আকাশ
বলাকার ঝাঁক—আমি উড়ে চলি
এখান হ'তে অন্য জগতে অন্য মাটিতে—

আমারও রঙ আছে—
আমারও বলার কথা আছে—
অনন্ত আকাশ, মাটি আমাকে ঘিরে রাখে
অথচ এই মাটিকে বড্ড ভয়—
যাওয়া শুধু যাওয়া নয়।

পরেশ সোম

লেখক

হলে পরেই খেয়াল
আমি স্বীয় অবকাশে
দিচ্ছি গেঁথে দেয়াল

তখন পাখি ডাকে
রঙেঢঙে টইটম্বুর
কৃষ্ণচূড়া শাখে

আবার বিপরীতে
হিংস্র ব্যাধ তীক্ষ্ণ শর
ছোঁড়ে আচম্বিতে

কিংবা হয়ে পাগল
কৃষ্ণচূড়া নিচ্ছে ছিঁড়ে
মানুষরূপী ছাগল

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

আছি বলেই

আছি বলেই চলে যাচ্ছে
রাত কেটে যায় একটি ঘুমে
কলার তুলে ঘুরে বেড়াস
এদিক সেদিক এ মোড় সে মোড়
বাপ মা তোদের অনাত্মীয়
স্বজন বন্ধু চায়ের দোকান
তুড়ি মেরেই দিন কাটছে
বাড়ি নয়তো সরাইখানা।

হাজার ঝক্কি আমার কাঁধে
আছি বলেই চলে যাচ্ছে
মরলে ভিটেয় ঘুঘু চরবে
ব্যাঙ ডাকবে—লিখে রাখিস।

সমীর চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্র সব সুখ দুঃখ

হাত বাড়ালেই আকাশ তার মধ্যিখানে চাঁদ
আশেপাশে ওত্ পেতে রয় অনেক মরণ ফাঁদ
চারিদিকে অজস্র লোক হরেক রকম মুখ
জলের মধ্যে নিজের ছায়ায় অহংকারী মুখ।
শহরের সব দালান কোঠা অন্ধকারে কানা
গ্রামের মাঠে ঝরে পড়ে আকাশ থেকে জ্যোৎস্না

মেঘ জমেছে মাঝ আকাশে, বুকের মধ্যে ঝড়
হৃদয়পুরের মোমের পুতুল ভাঙল খেলাঘর।

হাত বাড়ালেই সব সরে যায় কাছ থেকে বহুদূরে
পাখী হয়ে মন উড়ে যায় উদাসপুরের গাঁয়ে
মিথ্যে আমার ভালবাসা অহংকারী মুখ
বিচিত্র সব সুখ দুঃখ বুকের মধ্যে থাকুক।

পরম ক্ষত্রিয়

সে জনম আমার

তোমার জন্য একটা জনম চেয়ে রেখেছি আমি
একটা জনম কবিতা আমার।
আমার জন্মক্ষণের জন্মেরা সব এ উৎসবে আসবে তোমরা
পথেই পাতা শীতল-শিলাপটে রইলো সবার সাদর আমন্ত্রণ।

আকাশে যেদিন থাকবে না চাঁদ কিম্বা চন্দ্রিমা
দাঁড়ি ও কমা ডিঙিয়ে এসো নিশুতি-রাতের সামিয়ানা-তলে
ভাঙা-নদীর কূলে কূলে, সিঁথির বাঁয়ে ছোট্ট গাঁয়ে সে জনম আমার—
ভাঙ্ চুরমার বুকের পাটা তার জন্য ধন্য ধন্য
সেই জীবনের আঙিনায়।

আকাশ-শেষের মহারণ্যের সবচেয়ে যে বৃদ্ধ মহীরুহ
সে জানে আমার আকাশে আজ ভাঙা-চাঁদ কেন যে নেই
আজো তাই সমান দুরুহ ওই আলোকবর্ষ দূরের
নক্ষত্রের ভাষা।

তোমার জন্য একটা জনম তবু আসা
ভাঙা-নদীর কূলে কূলে, সিঁথির বাঁয়ে ছোট্ট গাঁয়ে সে জনম আমার।

পার্থ সরকার

প্রতীক্ষা

আমি জাতিস্মরের মত ঠিক ঠিক বলে দিতে পারি :
তোমার অরণ্য, উত্তুঙ্গ নদীর জল, সারামাঠময় সবুজশ্রেণী
এখনও আছে—অথচ কৈশোরের সরল উচ্ছাস
এখন আর নেই.....
আর নেই সেই মুগ্ধ হৃদয়, অমল বিশ্বাস।
কিন্তু স্বপ্নের মত চতুর্দিকেই তোমার সৃষ্ট বাহুর বিস্তার
এখন অহেতুক আমায় শৌখিন করে তুলে!

তুমি আমার শৌখিনতার ছদ্মবেশ খুলে নাও,
দ্যাখো, আমি এখন কত স্তব্ধ, কত বিষণ্ণ—
ঠিক তোমার উদাসীন শিল্পের মত.....

তোমার বুকের মৌলিক ব্যথা, তরুকের জীর্ণ রঙ
এবং প্রগতির লুপ্ত মহিমা সত্ত্বেও—
আমি বেঁচে আছি দুঃখে-সুখে
তোমার সোনালী আগমনের নিশ্চিত প্রতীক্ষায়।

ব্রততী ঘোষ রায়

সময় হে!

আলো মেখে চলে যায়
সে-সব সুস্থির দিন।
হাওয়ারাও দল বেঁধে ফেরে।

কে যেন ঘোষণা করে কোথায় অদৃশ্যে
"কেন হে প্রগাঢ় ঋতু
ইতিউতি ঝোঁকাঝুঁকি শুধু?

কৈশোর তোমার সেতো
কবে গেছে সরে,
পবিত্র মহল এক শ্বেত পাথরের
ধোয়া মোছা সাফসুফ।
কেন যে মেঘের দলে চেনামুখ খোঁজা
বাতাসেও পুরোনো নিঃশ্বাস?
কি এক সাহস নিয়ে
এ সময় কেন কানাকানি।
ইতিউতি ঝোঁকাঝুঁকি।
দেখে নাও নদীরাও
জল বুকে চলে যায় ছলছল"

চুপচাপ শুনে যাই
এসব তর্জন।
মেঘেদের টিটকিরি
কিম্বা সে আকাশের নিঃশব্দ সংলাপ।
পড়ন্ত বেলার শেষে
আমি শুধু শ্বাস ফেলে বলি—

স্বর্ণপাত্রে রাখা ছিল,—
মুখ খুলে কোথায় তলিয়ে গেছে
তরল যৌবন,
পাত্রও বিবর্ণ প্রায় চিনে নেওয়া দায়।

কেউ-ই তো দোষী নয়
সময় হে। সেই বড় তক্ষক প্রেমিক॥

অশোককুমার মহান্তী

অসম্ভব অলীক

আমি এগোতে থাকি
তুমি ধীরে ধীরে আমাকে অনুসরণ করতে থাকো
এবং সন্তর্পণে এক একটি পা ফেলে ক্রমশঃ কাছাকাছি হও
দেখবে ভয়ানক সাঁকো পেরুতে কালাবিলম্ব করোনা
দু'পাশের গিরিখাদে মৃত্যু নামক চিতা অজস্র হাঁ করে
চিৎপাৎ প্রহর গুণছে
ওখানে কেউ সমাজসেবী নেই, বন্ধু-ভ্রাতা নেই, প্রিয়জন নেই
যতই ডাকো সব অকারণ অরণ্যরোদনের মত হবে
এমন কি আমি ডাক শুনতে পেলেও
তোমাকে সাহায্য করতে ফিরে আসতে পারব না
বস্তুতঃ মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হবার মনোবল নেই কারো,
আমারও

তাই, সুনিপুণা নর্তকীর মতো অনায়াসেই তোমাকেও
দেহ উত্তোলন এবং অবনমন করতে হবে
যদি স্খলিত হও তার আগেই সুর থামিয়ে দিতে বলো।

মলয় গঙ্গোপাধ্যায়

ভিতরে ভিতরে টান

তোমাকে সময় দিয়ে আসা নয় এ শুধু
ভিতরে ভিতরে টান···

দীর্ঘ দাঁতে কাটি অন্ধকার, ঘুম, গাছের শিকড়
ছোট সীমাবদ্ধ জল চারিদিকে
চারিদিকে সুখময় সুখ, হাওয়া মানুষের মুখ

তোমাকে সময় দিয়ে আসা নয় এ শুধু
ভিতরে ভিতরে টান···

তীব্র আগুনের মধ্যে থেকে উঠে আসে সম্ভোগ আমার
নখে আঁচড়াই মাটি ছিঁড়ে ফেলি বাহিরের তাপ
হঠাৎ ডালপালাহীন গাছের জঙ্গলে রৌদ্র নামে
শাঁখ সাদা রমণীর নাভির মতন

তোমাকে সময় দিয়ে আসা নয় এ শুধু
ভিতরে ভিতরে টান···।

সুরজিৎ ঘোষ

লতা

কেমন ক'রে এলে ?
অবাক !
মা ছিল না ঘরে ?
সটান
পালিয়ে এলে আমার কাছে
শহর কলকাতায় ?
পালাও যেখান থেকে
ক্ষমা
পিছন পিছন ঘুরে
হঠাৎ
দেখবে কখন দাঁড়িয়ে আছে
ভিজে চোখের পাতায়।
তখন কি আর ভাসে ?
চোখ
মায়ের, বোনের টানে
যখন
আমার বুকে লুটিয়ে থাকে
ফুলের অন্তরায়।

থাকা

সুখে আছি, দুঃখে আছি,
প্রেমে ও অপ্রেমে আছি,
সন্দেহে, বিশ্বাসে আছি,
আছি হে।

শ্রমে ও বিশ্রামে আছি,
উঞ্ছে ও বিলাসে আছি,
প্রাপ্তি-বঞ্চনায় আছি,
আছি হে।

স্বপ্নে, জাগরণে আছি,
সত্যে, কল্পনায় আছি,
সারল্যে, শাঠ্যে আছি
আছি হে।

দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মাঝে
পথ ও বিপথের মাঝে
ঘুরছি যেন কানা-
মাছি হে।

তবুও নিশান আছে,
তবুও নিশানা আছে
(তাই) বিক্ষত হতে হতে
বাঁচি হে॥

দূরযান

হাজার দাঁড়ের পানসীখানি ভাসিয়ে দাও, ভাসিয়ে দাও,
হৃদয়লীনা, অচিনপুরে আমায় নিয়ে যাও।

ইচ্ছাবিধুর স্বপ্নখানি ছড়িয়ে দাও, ছড়িয়ে দাও,
অনুরাগের নৌকো ক'রে আমায় নিয়ে যাও।

ক্লান্ত দিনে গানের সুরে রাঙিয়ে দাও, রাঙিয়ে দাও,
সুদূরযানী, তোমার দেশে আমায় নিয়ে যাও।

সাগর চক্রবর্তী

যে ভাবে সনাক্ত করি নিজেকে

এই নষ্ট কমলালেবুর মতো শহর
এই পচে যাওয়া গ্রামগঞ্জ
এইখানেই তোমাকে থাকতে হবে……
এই তোমার জন্মভূমি
এই তোমার স্বদেশ!
তুমি নিজেও কি
একটা বাঁসি মৌচাকের চেয়ে ভালো!
যে কোনো পরাশ্রিত জানোয়ারের চেয়ে
এই বেঁচে থাকা
জন্মভূমি…স্বদেশ
একটা খোঁয়াড়
জল্লাদের বধ্যভূমি বা।

তুমি শুধু অপেক্ষা করো
কবে তোমাকে টেনে নিয়ে
হাড়কাটে ফেলা হবে।

এখানে এরই মধ্যে থাকতে হবে।
দীর্ঘদিন।
কেননা তোমার দুটো হাত তোমার পরিশ্রম
তোমার নিজের জন্য নয়।
কেননা তোমার মাথা তোমার নিজের নয়
কেননা তুমি যা লুকিয়ে ভাবো
তা করতে পারো না
পারবে না কোনোদিন
কারণ, তুমি একজন ক্রীতদাস!

স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে এই তোমার
একমাত্র পরিচয়।

দীপক সরকার

দর্শন

ভাবা যায় না, এখনো তেমন কিছু বার্তা রয়ে গেছে
মস্তিষ্ক হৃদয়ের অন্তর্গত,
আবহমানকাল ধরে
সূত্রের বিপরীতে সূত্র, মতের বিপরীতে অন্যমত গড়ে উঠে
এক সম্মিলিত সূত্র বা মত চলে যায় প্রবহমানতার দিকে।

শেষ কথা কখনোই উচ্চারিত নয়।

সনৎ বসু

এভাবেই ভেঙ্গে যায়.....

এভাবেই ভেঙ্গে যায় ঘর বাড়ী মাঠ ঘাট
বুকের পাঁজর—
অচিন পাখীর বুকে বিঁধে যায় তীর,
বিবর্ণ ফুলের শোকে কেঁদে মরে বিরহী ভ্রমর;

রক্তের উত্তাল স্রোত, সবুজ পিপাসা
ঝরা পালকের মত, অসহায় ভেসে যায়
কালের হাওয়ায়।

ঐ দেখ, আরো কিছু অর্বাচীন
কুটির ছাওয়াবে বলে
বয়ে আনে খড়কুটো নতুন আশায়।

জীবন নদীর জল কুলুকুলু গানে
অবিরাম ধেয়ে চলে সাগরের পানে।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

নাস্তি

জীবনে শাশ্বত সত্য কিছু নেই
নেহাৎ কথার কথা স্থির মূল্যবোধ।

অন্ধকারে আলো ফেললে
পলমাত্রে বদলে যায় জীবনের মানে
রসাতলে ভেঙে পড়ে স্বর্লোক সুষমা
ক্ষীণ আলো এনে দেয় আদি অন্ধকার!

কত দ্রুত, আলোরও অধিক দ্রুত
জীবনের এক সত্য অপর সত্যকে ছাড়ে পথ
যা ছিল নিঃসর্ত প্রেয়
তারই জন্য পদক্ষেপে দলা দলা থুতু উদ্গীরণ।

স্পেন

ভেসেন্ত আলেজান্দ্রের

বুড়ো মানুষটি এবং সূর্য

অনেক কাল বেঁচে ছিলেন তিনি। বুড়ো মানুষ। একটা গাছের গুঁড়ি—বেশ মোটাসোটা একটা গাছের গুঁড়ি—ঠেসান দিয়ে দাঁড়াতেন কত সন্ধ্যায়, সূর্য ডোবার সময়। তখন আমি যেতুম ও পথ দিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম। তিনি ছিলেন বুড়ো মানুষ, মুখে বলিরেখা, দুঃখের চেয়েও তাঁর চোখ দুটি ছিল বেশি নির্বাপিত। গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে তিনি দাঁড়াতেন। তাঁর কাছে প্রথমে পৌঁছত সূর্য, পায়ের পাতায় মৃদু কামড় দিত, কয়েক মুহূর্ত থেকে যেত গাঢ় হয়ে। তারপর উপরে উঠে যেত, আচ্ছন্ন করত, মগ্ন করত, তাঁকে টেনে নিত নিজের দিকে, মিষ্টি আলোয় ঐক্যবদ্ধ করত। হায়, ঐ বার্ধক্য কী ভাবে বেঁচে থেকে, পুনরুজ্জীবিত হয়ে, ফুরিয়ে যেত। যাবতীয় কৌতূহল, বিষাদময় জীবনের গল্প, বলিরেখার অবশেষ. ক্ষয়িষ্ণু চামড়ার দীনতা। কী ভাবে যে বিদায় নিত ধীরে ধীরে—উথার গুঁড়োর মতো বিলীয়মান। পাথর যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সর্বনাশা ঝড়ে মসৃণ গুঁড়োর মতো, অনেকটা তেমন। প্রতিধ্বনিময় সোচ্চার ভালোবাসার কাছে সে সমর্পিত। সেজন্যেই, সেই নীরবতায়, অনাবশ্যক হয়ে যেত বুড়ো মানুষটি, ধীরে ধীরে গা ভাসিয়ে দিত। আমি দেখতুম, অমোঘ সূর্যালোক দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে তাঁকে গভীর ভালোবাসায়, ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। এভাবেই আত্মসাৎ করত সে ধীরে ধীরে, এভাবে খুব অল্প অল্প করে তার আলোয় দ্রবীভূত করে নিত—যেমন করে মা তাঁর সন্তানকে টেনে নেন অতি নরম বুকে।

আমি ও পথ দিয়ে যেতুম আর এ দৃশ্য দেখতুম। দেখতুম, কথনো-বা অতি সামান্য তার অবশেষ। অতি ক্ষীণ অস্তিত্বের আভাসমাত্র। এরপর কী থেকে গেল প্রিয় বুড়োটার! মিষ্টি বুড়োটা এরই মধ্যে আলো হয়ে গেলেন, অতি ধীরে বিদায় নিলেন শেষ সূর্যালোকে, পৃথিবীর অন্য অনেক অদৃশ্য বস্তুর মতো।

স্বর্গের শহর

আমার দুচোখ তোমাকে দেখে সব সময়, সমুদ্রতীরে, আমার কালের শহর। অক্ষম পর্বত থেকে অতি ক্ষীণ ঝুলে আছ তুমি মাথা বাড়িয়ে নীল তরঙ্গমালার দিকে। মনে হয়, আকাশের নিচে, জলের ওপর, আকাশের অর্ধেকটা অব্দি তোমার রাজত্ব। যেন এক পয়মন্ত হাত, তোমাকে চিরকালের জন্য প্রিয় তরঙ্গে নিমজ্জিত করার আগে, ধরে আছে কোনো এক জ্যোতির্ময় মুহূর্তের জন্য।

তবু তুমি আছ একইভাবে, পতনহীন। সমুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে তোমার জন্য কিংবা গর্জন করে। আমার সুখের সময়ের শহর, আমার ধাত্রী নগরী, কী ভীষণ সফেদ! একদা আমি ছিলুম এখানে, আমার মনে পড়ে, দেবদূতের শহর, সাগরের চেয়ে দীর্ঘ তুমি, সুউচ্চ, তার ফেণার ওপরে আধিপত্য কর।

রাস্তাগুলি ফুরফুরে, কী হালকা আর সঙ্গীতময়। বাগানে পুষ্ট নধর পামগাছগুলি বৈষুবীয় ফুল ফোটায়। আলোর পাম মাথার ওপরে, ডানাওয়ালা, হাওয়ার উজ্জ্বলতা দোলায়। আর মুহূর্তের জন্য সাম্যাবস্থায় ধরে রাখে স্বর্গীয় অধর, যা নিজেকে অতিক্রম করে চলে যায়, অতি দূরের গন্তব্যে, যাদু দ্বীপপুঞ্জে, নীলের গভীরে বিচরণ করে স্বাধীন।

ভাগ্যবান শহর। হে নিগূঢ় নগরী! আমি বাস করেছি সেখানেও। মনোরম পাথরের ওপর দিয়ে আলতো পায়ে হেঁটে যায় তরুণেরা। আলোকিত দেয়ালগুলি প্রাত্যহিক পথচারীদের চুম্বন করে সব সময়, সউজ্জ্বল, হুল্লোড়ের জনতাকে।

আমি হাঁটতুম সেখানে মায়ের হাত ধরে। মনে হত, পেছনের পুষ্পিত শাখা থেকে এক বিষণ্ণ গীটার বাজিয়ে দিত তার চকিত সুর। সময়ে বন্দী, শান্ত রাত, শান্ততর ছিল ভালোবাসার জন, চিরকালের চাঁদের নিচে ভ্রাম্যমান কোনো এক মুহূর্তে।

যাদুকরী শহর! চিরকালের এক নিঃশ্বাস শেষ করে দিতে পারত তোমাকে, সেই মুহূর্তে, যখন ঈশ্বরের চেতনায় তুমি প্রকাশিত। একটা স্বপ্নের জন্য

মানুষ মরতে পারে, বাঁচতে পারে, স্বর্গীয় নিঃশ্বাসের মতো চিরকালের জন্য জ্যোতিষ্মান্।

উদ্যানসমূহ, ফুলগুলি! বালুর মতো সাহসী যে-সমুদ্র বহির্গত হয় নগরযাত্রায়, অতল জলরাশি থেকে পর্বতের মধ্যে, শাদা হাওয়ায়, যে-পাখি কোনোদিন গন্তব্যে পৌঁছয় না—তার সুসম দৃষ্টি নিয়ে। অ শহর, তুমি এই পৃথিবীর কেউ নও।

আমি আলতো পায়ে হাঁটতুম ঐ মায়ের হাত ধরে, তোমার পালক-উজ্জ্বল রাস্তায়। দিনে নগ্নপদ। রাতে নগ্ন পদ। পূর্ণ চাঁদ। পরিষ্কার সূর্য। ওখানে তুমি ছিলে আকাশ। আকাশে ছিলে তুমি, ও শহর, আকাশে ডানা মেলে উড়ে যেতে।

অনুবাদ ঃ গৌরাঙ্গ ভৌমিক

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে ঃ

অসমীয়া

মনজিৎ সিং

দূর অস্ত

কাক ডাকলেই তো ভোর হয় না
বন্ধু, তোমরা ভুল করো না
ভোর হতে এখনো ঢের দেরী—

সন্ত্রস্ত কাকের ঔদ্ধত্য আস্ফালনের কবল থেকে
ছিটকে পড়া রাত্রির শেষ প্রহর এখন।

সূর্যকে যদি নামিয়ে আনতে চাও
(আমরা তো আলোই চাই)
সূর্যমুখী ফুল যদি ফোটাতে চাও
(এই তো আমরাও চাই)
কাকগুলোর গলা টিপে ধর
ছিটকে পড়া এই রাত্রির শেষ প্রহরে।

বন্ধু মনে রেখো
বাঁধাটা কিন্তু আমাদেরই হাতে।

অনুবাদ ঃ উদয়ন বিশ্বাস

১

পৃথিবীর সবদেশেই বোধহয় অ আ ক খ আবিষ্কারের পরবর্তী অধ্যায়ে যখন নিজের মনের ভাব প্রকাশের জন্যে মানুষ সাহিত্য নামক শিল্পকর্মের গোড়াপত্তন করল তখন মুখের ভাষা গদ্যময় হলেও সেই নব আবিষ্কৃত ললিত শিল্পের বাহন হল কবিতা বা কাব্য। বাংলা দেশেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুতরাং বাংলা সাহিত্যও প্রাচীনতম চর্যাপদের কাল থেকে পঞ্চদশ শতকের প্রায় শেষ পাদ পর্যন্ত কাব্যাশ্রয়ীই হয়েছিল। প্রথম ওলট-পালটটা ঘটালেন চৈতন্যদেব এবং তাঁর উত্তরসূরীরা। বাংলাসাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব হল। এবং তারপর প্রায় পাঁচশত বিগত বৎসরে অগণিত সাহিত্যরথীরা তিল তিল সৌন্দর্যের উপচারে তাকে তিলোত্তমার সৌন্দর্যে সাজিয়ে তুলেছেন। আজ শুধু মননের সাহিত্যই নয় কাজের সাহিত্যের পরিধি ডিঙিয়ে গদ্যভাষা খোদ কাব্যসাহিত্যের আসন ধরেও টান দিয়েছে। কি কুক্ষণেই রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতার ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন আর তার ফলশ্রুতি হিসেবেই কিনা ভগবান জানেন, আজ তামাম বাংলাদেশ এক গণ-গদ্যকাব্য সাহিত্যের আবর্তে পড়ে ঘুরপাক এবং হাবুডুবু খাচ্ছে।

এইরকম যখন অবস্থা তখন কবি নচিকেতা ভরদ্বাজ বাংলা সাহিত্যে আর এক নতুন এক্সপেরিমেন্টের দরজা খুলে দিলেন। তিনি গদ্যসাহিত্যের খাস তালুকে কাব্যের চাষ বুনেছেন। গল্প, উপন্যাসের সুপরিচিত ধারার তিনি "অন্যরূপ রূপান্তর" ঘটিয়েছেন। সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের দরবারে কবি নচিকেতার পরিচয় নতুন করে দেবার আবশ্যক করে না। বাংলা কবিতার পাঠক তাঁর কাব্যকৃতীর সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত। কাব্যোপন্যাস "অন্যরূপ রূপান্তর" বাংলাসাহিত্যে তাঁর নবতম সংযোগ। নতুন ঢঙে, নতুন রূপ-রীতিতে, পুরানো উপাখ্যান নতুন করে বলেছেন নচিকেতা। তাঁর উদ্যম প্রশংসনীয়।

—শিশির ভট্টাচার্য

অন্যরূপ রূপান্তর—নচিকেতা ভরদ্বাজ। কল্পক প্রকাশনী। কলকাতা-৪। দাম ঃ পনের টাকা।

২

কবি পরেশ সোম অনেকদিন থেকে বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখছেন। সেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু কবিতা নিয়ে কিছু কাব্যগ্রন্থ। এতদিন পরে কেন এই কাব্যগ্রন্থ! অনেক আগেই এই কাজটি হওয়া উচিত ছিল। কেন হয় নি সে কথা অবান্তর। বহুদিন পরে হলেও এই কাব্যগ্রন্থ হাতে পেয়ে খুশি হয়েছি। মনোযোগ সহকারে পড়েছি। প্রতিটি কবিতা ছন্দের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতেই বোঝা যায় পরেশ সোম ছন্দবিষয়ক ধ্যান-ধারণা ভালভাবেই আয়ত্ত করেছেন। তবে এর মধ্যে কথা আছে—শুধু ছন্দ জানলেই কবিতা লেখা যায় না। কবিতা লিখতে হলে ছন্দের সংগে আরো কিছু চাই—যা কিনা কবিতা হয়ে উঠবে। অনুভূতি ও ভাবনার শিল্পসুষমার সমন্বয় ঘটেছে কিনা দেখতে হবে। পরেশ সোমের কবিতায় আমি তা লক্ষ্য করেছি। এইজন্য প্রতিটি কবিতাই ছন্দের তালে তালে কবিতা হয়ে উঠতে পেরেছে। আমার কথার স্বপক্ষে পরেশ সোমের কবিতার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি—

দেখেছি নিষাদ এক শিকার করে ফেরে
লম্বা দুটি হাত
আজ শহুরে পোলাও খাবে কাল বাসিভাত।
দেখেছি নিষাদ এক শিকার করে ফেরে।...

অথবা

থামুন, থামুন সুন্দরীরা, নাই বা এলেন কাছে
অনেকদিনের খিদে পাওয়া বাঘটা এখন ঘুমিয়ে আছে

এইরকম লাইন প্রতিটি কবিতায় রয়েছে। তবে বিষয়বস্তু নির্বাচন তেমন বলিষ্ঠ হয় নি। অন্যান্য কবিদের কাছে তেমন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারবে না। কেননা এই বিষয় নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। সুতরাং বিষয় আধুনিক হওয়া উচিত। আধুনিক কথাটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমি বলতে চাই আধুনিক মানে বর্তমান সময়ের প্রতিফলন। আশা করি কবি এদিকে একটু মনোযোগ দেবেন।

—জীবন সরকার

দেখেছি নিষাদ এক/পরেশ সোম। ভারতী প্রকাশনী, ৮/১ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিঃ-১২। দাম ঃ ৪ টাকা।

৩

'ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যান্ত্রিক উৎপাদন ও সামাজিক যুথবদ্ধতার ফলে ক্রমেই ঘটছে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিনাশ, মানুষ হয়ে পড়ছে অসংপৃক্ত, বিচ্ছিন্ন, ফলত একা। তাই দন্তয়েভস্কি ও বোদলেয়ার থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যের জগতে এত নিঃসঙ্গ মানুষের শেষহীন মিছিল' (আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়—অশ্রুকুমার শিকদার)—এই বিপন্ন সময়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় অভিজিৎ ঘোষের কাব্যগ্রন্থ—'নিঃসঙ্গ মানুষ'। বইটি সমালোচনা করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তেছে ; তাঁর 'সমালোচকদের প্রতি' কবিতা প্রদত্ত 'বালখিল্য' বিশেষণটি, অতএব, হজম করাই ভাল !

আবিষ্কারের আনন্দ বলতে যা বোঝায়, প্রত্যেক মানুষেরই কাম্য ; আমার মত অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত গ্রন্থপাঠের মধ্যেই তা পায়। অভিজিতের বইটি থেকে এ রকম ছোটোবড় অনেক আবিষ্কার, গতরাতে, আমি করেছি। তাঁর কবিতায় বিপন্ন বিষাদে হেঁটে যায় ইতালিয়ান রূপসী এক হিপি, অসভ্য ভাবে। বর্নেদি খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে কালো এক বেজন্মা বালিকা, কবির দ্বারা অনায়াস প্রত্যাখাত। চমকে উঠে দেখি, 'সীমা সান্যাল এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে ? তুমি কি এখনও এখানে/নিষিদ্ধ পল্লীতে থাকো ?···| ···আলো জেবলে দ্যাখো/আমি তোমার কত নম্বর লোক—/ঘরের জানালা টপকে অনায়াসে ঢুকে যাবো ? নাকি তুমি জোক্‌/করছো প্যান্টিবিহীন এলিজাবেথ টেলর ?··· (সীমা অসীমা)। অশ্লীল ! অশ্লীল ! পৈতেধারী সমালোচক চেঁচিয়ে উঠেন ; আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠে কবিতাটি বলে দেয় 'শিল্প' ! কিংবা কবিই বলেন, 'শুধুই অশালীন অশ্লীলতা নয়, বরং আরো কিছু বেশী···' (অনুরাগ)—এই বেশী, এই পাওয়া আমি প্রত্যক্ষ করি।

আমাদের কংক্রিট শহরে, তথাকথিত সভ্যতার অশালীন চিৎকার, সুচেতনার হৃদয়ে, হাঃ শুধু ঘাস। বেঁচে থাকা অথচ। মধ্যরাতে মাতাল ও ভিখিরীর ভিড়ে ফুটপাত বেসামাল ; বড় আকাঙ্ক্ষায়, একক সংগীতের মতো তিনি উচ্চারণ করেন, 'তাই লোকালয়ে গৃহস্থালী ঘর, কেশবতী (কেশবতী ?) কন্যার নয়ন/উজ্জ্বল বাসন্তী রঙে ঢাকা কিশোরীর মোহময় মায়া' (আমাদের সমাজ-সভ্যতা)। অকস্মাৎ স্বপ্ন ভেঙে যায়, কবি উঠে বসেন, জানলা দিয়ে চোখ রাখেন রাস্তায়, কবির প্যাডের পাতায় ভরে ওঠে মুমূর্ষু মানুষের স্বাভাবিক হতশ্বাস, 'মৃত শহরে ভিটামিনহীন···মানুষ/করুণ কান্নায় খোঁজে

বিকল্প প্রয়াস/···/সাহসের কাছে ক্ষয় করে সব পরমায়ু' (একদিন)। বুকের মধ্যে দরজা খোলে, বন্ধ হয়, রাত্রি তার খোলস খুলে ফেলে। তখন, 'প্রচণ্ড যৌনতা নিয়ে কে আসে সমর্থ পুরুষের কাছে উদ্ভিদ (উদ্ভিন্ন ?) যৌবনা/খোলে অক্লেশে বহুভোগ্যা বেশ্যার যোনি পটিয়সী নর্তকীর মতো !' (কেন ক্ষুধা, কেন নির্বিকার আমি)। জায়গা কম, তাই সংযমী হচ্ছি।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটির যান্ত্রিকতা, 'চার্জশীট', 'ওভারটাইম', 'বোনাস', 'লে-অফ', 'লক আউট', 'বয়লার থেকে টানা স্টীম লাইন' তাঁর কবিতায় ভাষা পায় ; এবং তুলনামূলক ভাবে পরবর্তী সময়েই 'সবুজ ঘাস, মাধবীর ছায়া ঘেরা আমাদের সুশীতল বাড়ী'র জন্য হাহাকার। লাইনে লাইনে ছড়িয়ে আছে এ রকম বহু চিত্রকল্প। খণ্ডচিত্রগুলি প্রায়ই রূপ পায় সমগ্রতায়। যা ত্রুটি, ক্রমশঃ দূরীভূত হবে, এ আমার বিশ্বাস।

কবিতা আর যাই হোক, চিৎকার অন্ততঃ নয়। অভিজিৎ তা জানেন, তাঁর কবিতা এই জানার সাক্ষ্য দেয়। অথচ মাঝে মাঝে আশাভঙ্গ হয়েছে আমার। পড়তে পড়তে থমকে গেছি, গোড়া থেকে আবার পড়েছি। তিনি কবি বলেই তাঁর কাছে হতাশ হতে কষ্ট হয়, কবি না হলে এই আলোচনারই প্রয়োজন ছিলো না।

প্রচ্ছদটি বিজ্ঞাপন-সদৃশ, অভিজিতের কবিতাই তাঁর পরিচয়, পাবলিসিটির যুগ হলেও এসব করার কোন যুক্তি নেই। 'হেমন্তের অনুভূতিমালা' ও অন্যান্য কয়েকটি কবিতাকে তিনি 'গদ্য কবিতা' শিরোনাম দিয়েছেন, যার প্রয়োজন ছিলো না ; পংক্তিতে সাজিয়ে দিলেই কবিতা, আর গদ্যাকারে থাকলেই 'গদ্যকবিতা' এ রকম তাঁর কেন মনে হলো ? কয়েকটি গদ্য আলোচনা কবিতার মধ্যেই সাজানো হলো কেন ? বানান ভুল চোখে পড়ে। ছাপা ও বাঁধাই খুব উচ্চমানের নয়। দশ টাকা দামটিও, ক্রেতার পক্ষে বড় বেশী।

—পিনাকী ঠাকুর

'নিঃসঙ্গ মানুষ' | অভিজিৎ ঘোষ | চাটার্ড কনসালটেন্ড | ২২/১, গড়িয়াহাট রোড (পশ্চিম) | কলকাতা-৬৮ | মূল্য ঃ দশ টাকা।

মালদা

পুষ্পজিত রায়ঃ ইনি মালদা কলেজের অধ্যাপক। মাঝবয়সের ভদ্রলোকের লেখার হাত ছড়া'য় খুব ভালো। স্থানীয় পত্র-পত্রিকা 'জোয়ার' তিনি সম্পাদনা করেন। প্রতি রবিবার সাহিত্য বাসরের আয়োজন থাকে ওনার বাড়ীতে। এর আগে ওনার ছড়ার বই 'ছড়া শুধু ছড়া নয়' নামে প্রকাশ পেয়েছে।

অমিত গুপ্তঃ মাঝবয়সের ভদ্রলোক। হাত কবিতায় ভালো। কোনো কবিতার বই বেরোয় নি। গ্রামে কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ছুটি থাকলে শহরে দেখা যায়।

গৌর দাসঃ বয়স, পঞ্চাশ বা দু'এক বছর কম। কালেক্টরীতে চাকুরী করেন। বেশ কয়েকখানা কবিতার বই কয়েক বছর আগে বেরিয়েছে। রাবীন্দ্রিক ছোঁয়া পাওয়া যায় ওনার কবিতায়। ইনি কাব্যশ্রী, সাহিত্যভারতী উপাধি লাভ করেছেন।

দেবযানী চক্রবর্তীঃ তিরিশের কম বয়সের অবিবাহিত মহিলা। শহরেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। 'উৎস সুকান্ত' নামে মালদার নামী পত্রিকা সম্পাদনা করেন। লেখার হাত বলতে কারো কারো মতে দুর্বোধ্যতা প্রকাশ করে।

তুহিন দাসঃ লুথার্ন সার্ভিস'এ সম্প্রতি চাকুরী পেয়ে শহরের পাশের গুল্ড মালদা থানা এলাকায় থাকেন। লেখার হাত বলতে কবিতায় নিজস্ব ঢং বা ছন্দ আছে। কোনো সংকলন প্রকাশ পায় নি।

অশোক সেনঃ স্থানীয় ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে কেরাণীর পোষ্টে আছেন। কবিতায় জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। 'আলফাবিটা' থেকে 'পরবাসের দুঃখে' কবিতার সংকলন বেরোবে বলে শোনা গেছে। স্থানীয় কাগজে বরাবর লিখে আসছেন।

অঞ্জলি দাসঃ মালদা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ছিলেন। সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থতায় তিনি গত ৪ঠা (?) ডিসেম্বরের '৭৭ কলিকাতার কোনো হাসপাতালে আমাদের ছেড়ে যান। 'সাহিত্য পত্র' নামে পত্র-পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন। তাঁর কবিতায় প্রেম, ভাবনা ও স্পর্শকাতরতার ছোঁয়া পাওয়া যায়।

অঞ্জন সেনগুপ্তঃ যুবক, বছর পঁচিশেকের হবেন। 'জোয়ার' পত্রিকার সহ-সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছেন। লেখায় সংগ্রামী মনোভাব স্পষ্ট, মানে যাকে বলে দেশপ্রিয়তা।

নিখিল সাহাঃ অসহ্য কষ্ট সহ্য করে এখন সাক্ষরতা কর্মী হিসেবে তিরিশ/বত্রিশের এই ভদ্রলোক মালদা জেলা সাক্ষরতা কমিটির সম্পাদনা করে যাচ্ছেন। লেখা মার্জিত, বক্তব্য নতুন দিনের আলোর প্রার্থী; সংঘর্ষে বেঁচে থাকার দীর্ঘ প্রয়াস। সম্ভবত কয়েক বছর আগে 'শতাব্দী' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।

মলয়শংকর ভট্টাচার্যঃ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে নিপুণ হাত বললেই চলে। এখন নর্থ বেঙ্গল ইউনিভারসিটিতে ইতিহাসের শেষ বছর কাটাচ্ছেন। কোনো সংকলন নেই। এককালে অর্থাৎ মালদায় থাকাকালীন বহু পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

তৃপ্তি মাস্ত্রাঃ আধুনিক রুচি নিয়ে কবিতাকে দেখেছিলেন। উৎস সুকান্ত'র সাথে বিশেষভাবে জড়িত মহিলা। অবিবাহিতা—এখন নর্থ বেঙ্গল ইউনিভারসিটিতে ইংরাজী নিয়ে ব্যস্ত। এখনও লেখা আমরা পেয়েই যাচ্ছি ওখান থেকে।

অনির্বাণ সেনঃ মালদা টাউন হাই স্কুল-এ শিক্ষকতা করেন। কোনো কবিতার বই নেই। লেখা চলনসই। ব্যস্ততা আছে। স্বভাব প্রাকৃতিক ও ঠিক নয় মেজাজী যেন।

ত্রিদিব গুপ্তঃ গল্প লেখেন, কবিতাও। অক্রুরমণি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা হলো পেশা। নেশা—সাহিত্য। 'মালদা বার্তা' সংবাদপত্র তিনি এখন প্রকাশ করছেন। রসিক লোক।

সঞ্চিত সাহাঃ এখন কোলকাতায় S.E.D.P-তে 'মাটির মানুষ' সম্পাদনা করছেন। আগে মালদায় 'শিশু আলেপন' ছোটদের পত্রিকা সম্পাদনা

করতেন। লেখায় নম্রতা আছে। এখন প্রবন্ধ, ফিচার, নিবন্ধ ছোটগল্প লিখছেন। বয়স ২৬/২৭।

দীপক দাস ঃ খুব পরিশ্রমী ছেলে। শহরের অন্যপ্রান্ত থেকে পায়ে হেঁটে টিউশানি করেন। কবিতা লেখেন নিজের মতো করে। স্টেনো কলেজের শিক্ষক। আর শহরের বিভিন্ন এলাকায় বহু পরিচিত, রঘু বলে সবাই চেনে।

দীপ্তিময় সরকার ঃ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখে থাকেন। সম্পাদিত পত্রিকা—"উত্তর মেঘ"।

দিলওয়ার হোসেন ঃ মোটামুটি বিনয়ী যাকে বলে, এই লোকটি সেই। 'পয়গম' পত্রিকার তথ্য সংগ্রাহক। গ্রামে ডাক্তারী পেশা আর নেশা —সাহিত্য। কবিতার বিস্তর পাণ্ডুলিপি প্যাকিং অবস্থায় নামাতে দেখা যায় ওনার বাড়ী গেলে। রসিকও বটে।

ঋত্বিক ঘোষ ঃ শৃংখলিত গত্রিকা সম্পাদনা করেন। বয়স ২৪/২৫ হবে। লেখায় ভাবালুতা আছে।

প্রবীর রায় ঃ নীরব, নিরীহ ছেলে। ডিপ্লোমা পাশ করে নীট্ বসে আছেন। 'আনন্দম্' পত্রিকা আনন্দম্ কালচারাল কমিউনিটি সেন্টারের পক্ষ থেকে সম্পাদনা করেন। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখেন। লেখায় জীবনানন্দ ও শক্তি-সুনীলের ছাপ দেখা যায়। কিছু জায়গায় আবার নিজস্ব ভাবনা প্রতিফলিত। 'যুগলবন্দী' সম্পাদনা করেছেন।

দিলীপ তলোয়ার (কনিষ্ঠ) ঃ 'বাল্মীকি' পত্রিকা একাই টেনে যাচ্ছেন। কলকাতা ও দক্ষিণের কিছু পত্রিকায় লেখা বেরোয়। কোনো কবিতার বই নেই। কলেজের পড়া শেষ হয় নি। লেখায় নিজস্ব টান স্বাভাবিকভাবে আছে। কিছু অন্য মননশীলতাও যোগান দেন। সম্প্রতি 'যুগলবন্দী', ('আনন্দম্' ও 'বাল্মীকি') পত্রিকার যৌথ সংগঠনে সম্পাদনা করেছেন।

———

কবি-সম্মেলন

শীত যখন শাল সোয়েটারের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তখন মাটির ভাঁড়ে ধোঁয়া ওঠা চা এসে পড়ল। ষোল মাত্রায় কবিতার দাপট কী ভীষণ। তখন সাঁঝ বেলা।

অল ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল পোয়েট্স্ কংগ্রেস আয়োজিত কবি সম্মেলন গত ১৫ই জানুয়ারী হয়ে গেল। রক্ষণভাগে পুরোধা ছিলেন ধীমান চক্রবর্তী। অজিতকৃষ্ণ সরকার কবিতা পাঠের শেষে বক্তব্য রাখছিলেন যে, সমস্ত কবিতাই উত্তীর্ণ হতে পেরেছে কাব্যগুণে। নির্মল বসাক বলছিলেন, পঠনের ওপর অনেক বেশী কবিতা নির্ভরশীল। অতএব কেউ কেউ এটাকে মাড়িয়ে যেতে পারেন নি। মলয় গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থ সরকার, শৈবাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল ভৌমিক, প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপন রায়, সুশান্ত রায় ও নিমাই চক্রবর্তীর গলায় ভালো কবিতা শোনা যায়। সৈয়দ কওসর জামাল বিস্তৃত আলোচনায় সমস্ত কবিতার ভালো মন্দ ভাঙতে ভাঙতে কবিতার শরীর ও ভাবকে তুলে ধরেন। সবশেষে অসাধারণ একটি গল্প সবাইকে ছুঁয়ে যায়, লেখক অধীর বিশ্বাস। সম্পাদনার কাজ তরুণ গল্পকার জীবন সরকার করে থাকেন।

সারা বাংলা কবি সম্মেলন

গত ২৫শে জুন বেকার হলে সারা বাংলা কবি সম্মেলন হয়ে গেল। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। এই উপলক্ষ্যে বহু লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ হয়েছিল। দীপক দে লিট্ল ম্যাগাজিন ডাইরেকটরি প্রকাশ করে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন।

বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারা এই সুন্দর অনুষ্ঠানকে কিঞ্চিৎ ব্যাহত করেছে।

২৫শে বৈশাখ

এবার ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত কবি সম্মেলনে 'অন্যদিনে'র তরফ থেকে জীবন সরকার কবিতা পাঠের জন্য নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ; এজন্য 'অন্যদিন' গর্বিত।

অন্যদিনের কবিতা

'অন্যদিনের কবিতা' প্রকাশ হয়েছে। 'অন্যদিনে' এ যাবৎ যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে সেই কবিতা থেকে বাছাই করে এই কবিতা সংকলন। আমাদের দপ্তরে এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে অনেকেই চিঠি লিখেছেন। তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

'অন্যদিনের কবিতা' নামকরণ অন্যদিনের সহযোগী সম্পাদক জীবন সরকারের। শুধু তাই নয়, জীবন সরকারের সহযোগিতা ভিন্ন এই সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

দিনেশ দাসের সম্বর্ধনা

প্রায় শতাধিক পরিচিত কবি, সম্পাদকদের উপস্থিতিতে বাংলা কবিতার কিংবদন্তী পুরুষ কাস্তে কবি দিনেশ দাসকে সম্বর্ধিত করেন প্রতিথযশা সাহিত্যপত্র 'সমীক্ষণ' গোষ্ঠী। হাওড়ার অভিজাত মঞ্চ রামগোপাল মঞ্চে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গহণ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ। সভাপতি সেদিন প্রভৃতে আনন্দ পান, এবং সেইভাবে সভায় তাঁর স্মৃতিচারণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলা কবিতার এই জনপ্রিয় পুরোধা কবির সম্মানে আমরা আনন্দিত। ডঃ সুশীল রায় তাঁর ভাষণে কবির সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণ ধর, আশিস সান্যাল প্রমুখ। অগ্রজ কবি মণীন্দ্র রায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কবিকে সুদৃশ্য ট্রেতে ধুতি, উত্তরীয় প্রভৃতি

প্রদান করেন। সভায় মানপত্র পাঠ করেন খ্যাতনামা আবৃত্তিকার ও তরুণ কবি পঙ্কজ সাহা। এরপর শুরু হয় কবি সম্মেলন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঃ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শান্তনু দাস, সামসুল হক, সাধনা মুখোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব দেব, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুসিতকান্তি রায়, গৌতম গুহ, কমল তরফদার, প্রদীপ রায়চৌধুরী, শ্যামল বসু, সমরেন্দ্র দাস, স্বপন চক্রবর্তী, হরিপদ দে, ব্রজ চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু ঘোষাল, সনৎকুমার ঘোষ, দেবী রায়, শ্রীকুমার চক্রবর্তী, প্রদোষ দত্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যদিনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন শিশির ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন ঋষিণ মিত্র ও অজিত পান্ডে।

সমীক্ষণের পক্ষ থেকে সম্পাদক সুনীল কোলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সম্মেলনটি সার্থক রূপ নেয়। সমাগত অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন— সম্পাদক।

মাইকের বদলে মোমবাতি

'ভাবনা'র পক্ষ থেকে ৩।৫।৭৮ তারিখে সরোজকুমার রায়চৌধুরীর বাসভবনে একটি কবিসভা আহ্বান করা হয়েছিল। আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল সন্ধ্যা ৬টায় ; কিন্তু লোডশেডিং-এর জন্য সভা আরম্ভ হতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত কবিরা সন্ধ্যা ৭টায় অন্ধকারের মধ্যেই সভা আরম্ভ করলেন মাইকের বদলে মোমবাতি হাতে নিয়ে। একে একে কবিতা পড়লেন ঃ স্বপন ভট্টাচার্য, অশোক মুখোপাধ্যায়, গৌতম বাগচী, সুশীল পাঁজা, তথাগত চক্রবর্তী, অজয় নাগ, পরিমল চক্রবর্তী, জীবন সরকার, অলকেন্দুশেখর পত্রী, শুভাশিস গোস্বামী এবং মুকুল গুহ। সভায় পৌরোহিত্য করলেন কবি রাণা বসু। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন কবিবৃন্দ এবং রাণা বসু, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, তুষারাভ রায়চৌধুরী।

প্রকাশিত হল

অন্যদিনের কবিতা

সত্তর দশকে লেখা কবিতার সংকলন

গত দশ বছরের মধ্যে রচিত শতাধিক প্রবীণ ও নবীন কবির কবিতা এই সংকলনে গ্রথিত হয়েছে। একটা কালের কাহিনী এ'কে বলা যেতে পারে। কবিতার ভাষা, কবিতার আঙ্গিক, কবিতার রূপকলা কীভাবে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে—এ'তে তার স্বাক্ষর পাওয়া যাবে।

শিশির ভট্টাচার্য সম্পাদিত

দাম ঃ ৭·৫০

অন্যদিন ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেন্স, কলকাতা-৪৫